তফসীরে

মা'আরেফুল-কোরআন

চতুর্থ খণ্ড

[সূরা আ'রাফের ৯৪ নং আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত এবং সূরা আনফাল, সূরা তওবা, সূরা ইউনুস ও সূরা হুদ পর্যন্ত]

মূল

হযরত মাওলানা

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)

অনুবাদ

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

দ্বিতীয় সংস্করণে অনুবাদকের আরজ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে 'তফসীরে-মা'আরেফুল কোরআন' চতুর্থ খণ্ডের বাংলা অনুবাদ-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। সাম্প্রতিককালে উর্দু ভাষায় প্রকাশিত এবং আট খণ্ডে সমাপ্ত এ সর্ববৃহৎ ও সর্বাধুনিক তফসীর গ্রন্থটির প্রথম বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর সুধী পাঠকগণের তরফ থেকে যেরূপ উৎসাহপূর্ণ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে, তাতে অক্ষম অনুবাদক এবং যাঁরা এই বৃহৎ গ্রন্থটি যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে পাঠকগণের হাতে তুলে দিতে রাতদিন অক্লান্ত শ্রম স্বীকার করেছেন, তাঁদের পক্ষে আশাতীত উদ্দীপনা অনুভব করাই স্বাভাবিক। প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্ তা'আলার তওফীকই সকল কর্ম সমাধা হওয়ার মূল কারিকা শক্তি। বলা বাহুল্য, বাংলা ভাষাভাষী পাঠকগণের সীমাহীন আগ্রহের ফলেই হয়ত আল্লাহ্ তা'আলা অতি অল্প সময়ের মধ্যে এ বিরাট গ্রন্থটির অনুবাদকার্য সমাপ্ত এবং অতি অল্পদিনের ব্যবধানে সব কয়টি খণ্ড প্রকাশ করার সকল সু-ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

এ মহতী গ্রন্থের দ্রুত অনুবাদ এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজে অনেক সুধী বন্ধু আমাকে সক্রিয় সাহায্য করেছেন। বিশেষত এ খণ্ডটির প্রকাশনা পর্যন্ত যাঁরা আমাকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের মধ্যে মাওলানা আবদুল অজীজ, হাফেজ মাওলানা আবু জাফর, মাওলানা আবদুল লতীফ মাহমুদী, মাওলানা সৈয়দ জহীরুল হক প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। দোয়া করি এবং সকলের দোয়া চাই, যেন আল্লাহ্ পাক এঁদের সকলের এ নেক প্রচেষ্টা কবুল করেন এবং আরও অধিকতর খিদমত করার তওফীক দান করেন। অনূদিত পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া বিশেষ যত্নসহকারে নিরীক্ষণ করে দিয়েছেন বিশিষ্ট আলিম মাদরাসায়ে আলীয়া ঢাকার বর্তমান হেড মাওলানা জনাব আল্লামা উবায়দুল হক, আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ বিশেষত এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন মহা-পরিচালক জনাব আঃ সোবহান, সচিব জনাব ফিরোজ আহমদ আখতার ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক জনাব অধ্যাপক আবদুল গফুর প্রমুখ এ গ্রন্থটি প্রকাশ করার ব্যাপারে বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ প্রদান করার ফলেই এ বিরাট কাজ সহজে সমাধা করা সম্ভবপর হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের এ মহতী উদ্যোগের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করুন। আমীন!

'মা'আরেফুল-কোরআন'-এর অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর বহু সুধী পাঠক ব্যক্তিগত পত্রের মাধ্যমে অনেক মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ দান করেছেন। আমরা তাঁদের এসব পরামর্শ পরবর্তী সংস্করণগুলোতে অনুসরণ করার চেষ্টা করছি। সুধী পাঠকগণের খেদমতে আরজ, কারো চোখে এ মহতী গ্রন্থে কোন অসংলগ্নতা দৃষ্টিগোচর হলে পত্র মারফত আমাদেরকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো।

বিনীত

মুহিউদ্দীন খান

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূরা আরাফ-এর ৯৪ থেকে ৯৯ আয়াত	১
পূর্ববর্তী নবীগণের শিক্ষণীয় ঘটনাবলী	৩
হযরত মূসা (আ) ও তাঁর মু'জিযা	২২
হযরত মূসা ও যাদুকর সম্প্রদায়	২৮
হযরত মূসা ও ফিরাউন	২৯
জটিলতা ও বিপদমুক্তির ব্যবস্থা	৩৬
রাষ্ট্রনায়কগণের জন্য পরীক্ষা	৩৭
ইবাদতের বেলায় চান্দ্র হিসাব	৫৬
আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে ৪০ দিনের তাৎপর্য	৫৬
সর্বকাজ স্থির-ধীরভাবে সমাধা করার শিক্ষা	৫৬
প্রয়োজনে স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ	৫৭
অহঙ্কারের পরিণতি	৬৬
কোন কোন পাপের শাস্তি	৭৩
মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর উম্মতের বৈশিষ্ট্য	৮০
তওরাত ও ইঞ্জিলে হযরত মুহাম্মদ (সা)	৮২
কোরআনের সাথে সুন্নাহর অনুসরণ	৯০
মহানবীর (সা) নবুওয়ত ও কারামত	৯৫
ধর্মের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা	১১৫
আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদার বিশ্লেষণ	১১৭
আল্লাহ্‌র নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	১২৪
না বোঝা ও না শোনার তাৎপর্য	১৩৮
আসমায়ে হুসনার তাৎপর্য	১৪১
দোয়া করার আদব-কায়দা	১৪২
আল্লাহ্‌র নামের বিকৃতি সাধন ও কাউকে আল্লাহ্‌র নামে সম্বোধন	১৪৪
কিয়ামত কবে হবে ? নবী রসূলগণ ও গায়েবের খবর	১৫৪
কোরআনী চরিত্রের হিদায়েতনামা	১৭০
আল্লাহ্‌র যিকিরের নিয়ম-পদ্ধতি	১৮৩
সূরা আন্‌ফাল শুরু	১৮৯
পরস্পরের সৌহার্দ্য ও ঐক্যের ভিত্তি	১৯৫
মুমিনের বিশেষ গুণবৈশিষ্ট্য	১৯৭
ইসলামে সমরনীতি ঃ বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গ	২২২
ফেতনা ও দ্বীন শব্দের ব্যাখ্যা	২৬৩
যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বিধান	২৬৯
জিহাদে কৃতকার্যতা লাভের উপায়	২৮৬
শয়তানের ধোঁকা ঃ বাঁচার উপায়	২৯৪
ইসলামী রাজনীতি ও জাতীয়তা	৩০৬
মুসলমানদের পারস্পরিক স্থায়ী ঐক্য ও সম্প্রীতির প্রকৃত ভিত্তি	৩১৮
মুহাজিরগণের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ	৩৩৭
সূরা তওবা শুরু	৩৪৭
মক্কা বিজয় ঃ মুশরিকদের বিভিন্ন শ্রেণী ঃ চুক্তি ও তার মর্যাদা রক্ষার নির্দেশ	৩৫৩
ইসলামের সপক্ষে দলীল-প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব	৩৬২

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমান	৩৬২
নিষ্ঠাবান মুসলমানের আলামত ঃ	
অমুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব	৩৭০
আল্লাহ্‌র যিকির জিহাদের চেয়ে পূণ্য কাজ	৩৭৮
হিজরতের মাসায়েল	৬৮৩
পূর্ণতর ঈমানের পরিচয়	৩৮৩
হোনাইন যুদ্ধ ঃ আনুষঙ্গিক বিষয়	৩৮৬
মসজিদুল হারামে প্রবেশের অধিকার	৩৯৪
আহলে-কিতাব প্রসঙ্গ ঃ জিযিয়ার তাৎপর্য	৪০৩
চান্দ্র মাসের হিসাব	৪১১
তাবুক যুদ্ধ প্রসঙ্গ	৪১৮
দুনিয়ার মোহ ঃ আখিরাতের প্রতি উদাসীনতা	৪২০
সদ্‌কা ও যাকাতের ব্যয়খাত	৪৩৩
মুনাফিক প্রসঙ্গ	৪৫৫
সাহাবায়ে কিরাম জান্নাতী ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি প্রাপ্ত	৪৯৪
মুসলমানদের সদ্‌কা-যাকাত আদায় করে তা যথাযথ খাতে ব্যয় করা	
ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব	৫০০
তাবুক যুদ্ধ ও আনুষঙ্গিক বিষয়	৫২০

বিষয়	পৃষ্ঠা
দীনি ইলম প্রসঙ্গ	৫৩৬
রসূলে-করীমের গুণবৈশিষ্ট্য	৫৪৪
সূরা ইউনুস শুরু	৫৪৬
আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতের নির্দশন	৫৬০
কাফির ও মুসলমানদের জাতীয়তা	৫৭৪
আখিরাতের আযাব থেকে মুক্তির পথ	৫৯৭
আল্লাহ্‌র ওলীগণের অবস্থা	৬০২
হযরত মূসা-হারুন ও বনী ইসরাঈল	৬১৮
হযরত ইউনুস প্রসঙ্গ ঃ একটি বিভ্রান্তি ও তার জবাব	৬৩৫
সূরা হুদ শুরু	৬৪২
সৃষ্ট জীবের রিযিক	৬৫১
রসূলে করীম (সা)-তূর বুওয়ত ঃ সন্দেহবাদীদের জবাব	৬৫৯
সৎকর্ম গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত	৬৬৫
হযরত নূহ ও তাঁর জাতি	৬৭৭
যানবাহনে আরোহণের আদব	৬৯২
কাফির ও জালিমদের জন্য দোয়া	৬৯৯
সামুদ জাতি	৭০৮
হযরত ইবরাহীমের মেহমান	৭১৬
হযরত লূত এর কওম	৭২৪
হযরত শোয়াইব প্রসঙ্গ	৭৩৩
ওজনে হেরফের করার ব্যাধি	৭৩৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّآ اَخَذْنَآ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ
وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ﴿٩٤﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى
عَفَوْا وَّقَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً
وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩٥﴾ وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا
عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا
كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٦﴾ اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا
وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ ﴿٩٧﴾ اَوَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ
يَلْعَبُوْنَ ﴿٩٨﴾ اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٩٩﴾

(৯৪) আর আমি কোন জনপদে কোন নবী পাঠাইনি তবে (এমতাবস্থায়) পাকড়াও করেছি সে জনপদের অধিবাসীদের কষ্ট ও কঠোরতার মধ্যে, যাতে তারা শিথিল হয়ে পড়ে। (৯৫) অতপর অকল্যাণের স্থলে তা কল্যাণে বদলে দিয়েছি। এমনকি তারা অনেক বেড়ে গিয়েছে এবং বলতে শুরু করেছে, আমাদের বাপ-দাদাদের উপরও এমন আনন্দ-বেদনা এসেছে। অতপর আমি তাদের পাকড়াও করেছি এমন আকস্মিকভাবে যে, তারা টেরও পায়নি। (৯৬) আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং পরহিযগারী অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানী ও পার্থিব নিয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আমি তাদের পাকড়াও করেছি তাদের কৃতকর্মের বদলাতে! (৯৭) এখনও কি এই জনপদের অধিবাসীরা এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত যে, আমার আযাব তাদের উপর রাতের বেলায় এসে পড়বে অথচ তখন তারা থাকবে ঘুমে অচেতন। (৯৮) আর এই জনপদের অধিবাসীরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে যে, তাদের উপর আমার আযাব দিনের বেলাতে

এসে পড়বে অথচ তারা তখন থাকবে খেলাধুলায় মত্ত। (৯৯) তারা কি আল্লাহ্‌র পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে? বস্তুত আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে তারাই নিশ্চিন্ত হতে পারে, যাদের ধ্বংস ঘনিয়ে আসে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আমি (উল্লিখিত এবং সেগুলো ছাড়াও অন্য জনপদসমূহের মধ্যে) কোন জনপদে কোন নবী পাঠাইনি। (এমতাবস্থায় যে,) সেখানকার অধিবাসীদের (প্রেরিত নবীকে অমান্য করার দরুন পূর্বাহ্নে সতর্ক করে দেওয়া হয়নি এবং সতর্কতার উদ্দেশ্যে তাদেরকে) আমি দারিদ্র্য ও ব্যাধিতে পাকড়াও করিনি যাতে তারা শিথিল হয়ে পড়ে (এবং কুফরী-কৃতঘ্নতা ও মিথ্যারোপ থেকে তওবা করে নেয়)। অতপর (যখন তারা তাতেও সতর্ক হয়নি, তখন পালাক্রমে কিংবা এ কথা বুঝতে যে, বিপদের পর যে নিয়ামত দান করা হয়, তার মূল্য অধিক হয় এবং নিয়ামতদাতার প্রতি মানুষ স্বাভাবিকভাবে আনুগত্য প্রকাশ করতে থাকে) আমি দুরবস্থাকে সচ্ছলতায় বদলে দিয়েছি। এমন কি তাদের (ঐশ্বর্য ও সুস্বাস্থ্যের সাথে সাথে ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিতেও) বিপুল উন্নতি (সাধিত) হয়েছে। আর (তখন নিজেদের দুর্মতির দরুন) বলতে শুরু করেছে যে, (প্রথমত, সে বিপদাপদ আমাদের কুফরী-কৃতঘ্নতা ও মিথ্যারোপের কারণে ছিল না। যদি তাই হতো, তবে সচ্ছলতা আসবে কেন? বরং তা হলো সময়ের ঘটনা প্রবাহ। সে জন্যই) আমাদের পিতা-পিতামহদের জীবনেও (এ দু'টি অবস্থা কখনও) অসচ্ছলতা, (কখনও) সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। (তেমনিভাবে আমাদের উপর দিয়েও তাই অতিবাহিত হয়ে গেল। যখন তারা এমনি বিভ্রান্তিতে পড়ল) তখন আমি তাদের আকস্মিকভাবে পাকড়াও করেছি। (ধ্বংসাত্মক আযাবের আগমনের কোন) খবরও ছিল না। (অবশ্য নবীরা সংবাদ দিয়েছিলেন, কিন্তু যেহেতু তারা সে সংবাদকে ভুল মনে করেছিল এবং আমোদ-প্রমোদে বিভোর হয়েছিল, সেহেতু তাদের ধারণাই হয়নি।) আর (আমি তাদের ধ্বংসাত্মক আযাবের মধ্যে পাকড়াও করেছি, তার কারণ ছিল শুধু তাদের কুফরী ও বিরোধিতা। তা না হলে) যদি সে জনপদের অধিবাসীরা (পয়গম্বরদের প্রতি) ঈমান আনত এবং (তাদের বিরোধিতা থেকে) বেঁচে থাকত, তাহলে আমি (পার্থিব ও আসমানী বিপদের স্থলে) তাদের উপর আসমানী ও পার্থিব বরকতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম। (অর্থাৎ আকাশ থেকে বৃষ্টি এবং ভূমি থেকে বরকতময় উৎপাদন দান করতাম। অবশ্য এ ধ্বংসের আগে তাদেরকে সচ্ছলতাও দেয়া হয়েছিল একটা রহস্যের ভিত্তিতে। কিন্তু সে সচ্ছলতার মধ্যে বরকত না থাকার কারণে তা প্রাপ্ত নিয়ামতের পরিবর্তে জীবনের জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। যেসব নিয়ামতে কল্যাণ ও বরকত থাকে, তা দুনিয়া কিংবা আখিরাত কোনখানেই বিপদরূপে গণ্য হতে পারে না। মূল কথা, তারা যদি ঈমান ও পরহিযগারী অবলম্বন করত তাহলে তাদেরকেও এসব বরকত দেওয়া হত।) কিন্তু তারা যে (পয়গম্বরদেরই) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। তাই আমি (-ও) তাদের (গর্হিত)

কর্মের জন্য তাদের ধ্বংসাত্মক আযাবের মধ্যে নিপতিত করেছি। (উপরের আয়াতে একেই أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। তারপর বর্তমান কাফিরদের ভর্ৎসনামূলক ভাষায় শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, এ সমস্ত কাহিনী শোনার) পরেও কি (বর্তমান) এই জনপদের অধিবাসীরা [যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে বর্তমান] এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে যে, তাদের উপর (-ও) আমার আযাব রাতের বেলায় এসে পড়তে পারে যখন তারা থাকবে (বিভোর) ঘুমে (অচেতন)। আর (বর্তমান) জনপদের অধিবাসীরা কি (কুফরী ও মিথ্যারোপ সত্ত্বেও যা পূর্ববর্তী কাফিরদের ধ্বংসের কারণ ছিল) এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেছে যে, (সেই পূর্ববর্তী-দের মতই) তাদের উপরেও আমার আযাব দিন-দুপুরে এসে পড়তে পারে, যখন তারা থাকবে নিজেদের অহেতুক খেলাধুলায় (অর্থাৎ পার্থিব কাজ-কারবারে) নিমগ্ন? হ্যাঁ, তাহলে কি আল্লাহ্ তা'আলার এই (আকস্মিক) পাকড়াও থেকে (যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে) নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে। বস্তুত (জেনে রেখো) আল্লাহ্ তা'আলার পাক-ড়াও সম্পর্কে একমাত্র তাদের ব্যতীত কেউই নিশ্চিন্ত হতে পারে না, যাদের দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে এসেছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী নবীরা (আ) তাঁদের জাতিসমূহের ইতিহাস এবং তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক অবস্থা ও স্মরণীয় ঘটনাবলী, যার বর্ণনাধারা কয়েক রুকূ পূর্ব থেকেই চলে আসছে, তাতে এ পর্যন্ত পাঁচজন নবীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ কাহিনীটি হযরত মূসা (আ) এবং তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের। এ কাহিনীর আলোচনা পরবর্তী নয়টি আয়াতের পর বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হতে যাচ্ছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, কোরআনে করীম বিশ্ব-ইতিহাস এবং বিশ্বের বিভিন্ন জাতির অবস্থা বর্ণনা করে। কিন্তু তার বর্ণনারীতি হল এই যে, তাতে সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থ কিংবা গল্প-উপন্যাসের মত আলোচ্য বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা না করে বরং স্থান ও কালের উপযোগিতা অনুসারে ইতিহাস ও গল্প-কাহিনীর অংশবিশেষ তুলে ধরা হয়। সে সঙ্গে আলোচ্য কাহিনীতে প্রাপ্ত নিদর্শনমূলক ফলাফল সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। এ নিয়ম অনুযায়ী সে পাঁচটি কাহিনী বর্ণনার পর এখানে কিছু সতর্কতামূলক প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, নূহ (আ)-এর সম্প্রদায় এবং 'আদ' ও 'সামূদ' জাতিকে যেসব ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা শুধুমাত্র তাদের সাথেই এককভাবে সম্পৃক্ত নয়, বরং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্বীয় রীতি অনুযায়ী দুনিয়ার বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট জাতি-সম্প্রদায়ের সংশোধন ও কল্যাণ সাধনকল্পে যে নবী-রসূল প্রেরণ করেন তাঁদের আদেশ-উপদেশের প্রতি যারা মনোনিবেশ করে না প্রথমে তাদেরকে পার্থিব বিপদাপদের সম্মুখীন করা হয়, যাতে এই বিপদাপদের চাপে তারা নিজেদের গতিকে

আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি পরিবর্তিত করে নিতে পারে। কারণ প্রকৃতিগতভাবেই মানুষের মনে বিপদাপদের মুখেই আল্লাহ্র কথা স্মরণ হয় বেশি। আর এই বাহ্যিক দুঃখ-কষ্ট প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ রাহমানুর-রহীমেরই দান। সে জন্যই মাওলানা রুমী বলেছেন ঃ

خلق را با تو چنیں بد خو کنند ـ تا ترا نا چار او رسوا کنند

উল্লিখিত আয়াতে أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ

বাক্যটির মর্মও তাই। باساء ও بوءس শব্দ দু'টির অর্থ দারিদ্র্য ও ক্ষুধা। আর ضرّ ও ضرّاء শব্দদ্বয়ের অর্থ হলো রোগ ও ব্যাধি। কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত অর্থেই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা)-ও এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। কোন কোন অভিধানবিদ অবশ্য بأساء ও بؤس শব্দ দু'টির অর্থ আর্থিক ক্ষতি এবং ضراء ও ضر অর্থ শারীরিক বা স্বাস্থ্যগত ক্ষতি বলে উল্লেখ করেছেন। মূলত উভয়বিদ অর্থেরই মর্ম এক।

আয়াতটির মর্ম হচ্ছে এই যে, যখনই আমি কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রতি রসূল প্রেরণ করি এবং সে জাতি তাঁদের কথা অমান্য করে, তখন আমার রীতি হলো, প্রথমে সে অবাধ্য লোকগুলোকে পৃথিবীতেই অর্থনৈতিক ও শারীরিক ক্ষতি আর রোগ-ব্যাধির সম্মুখীন করে দেয়া যাতে তারা শিথিল হয়ে পড়ে এবং পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে। অতপর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে একগুঁয়েমি ঃ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوا এখানে سيئة শব্দে পূর্বোল্লিখিত দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও রোগ-ব্যাধির দুরবস্থাই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর حسنة শব্দে উদ্দেশ্য করা হয়েছে দারিদ্র্য-ক্ষুধা ও রোগ ব্যাধির বিপরীত দিক ; ধন-সম্পদের বিস্তৃতি ও সচ্ছলতা এবং সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা। পরবর্তী عَفَوا শব্দটি عفو থেকে উদ্ভূত। এর একটি অর্থ হয় প্রবৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করা। বলা হয় عفا النبات ঘাস বা বৃক্ষের প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। عفا الشحم والوبر অর্থাৎ পশুর মেদ ও লোম বেড়ে গেছে। এ অর্থেই এখানে عَفَوا শব্দের অর্থ হবে বেড়ে গেছে বা উন্নতি করেছে।

সারমর্ম এই যে, প্রথম পরীক্ষাটি নেয়া হয়েছে তাদের দারিদ্র্য, ক্ষুধা এবং রোগ-ব্যাধির সম্মুখীন করে। তারা যখন তাতে অকৃতকার্য হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ফিরে আসেনি, তখন দ্বিতীয় পরীক্ষাটি নেয়া হয় দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ-ব্যাধির পরিবর্তে তাদের ধন-সম্পদের প্রবৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দানের মাধ্যমে। তাতে

তারা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে এবং অনেক গুণে বেড়ে যায়। এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল যাতে তারা দুঃখ-কষ্টের পরে সুখ ও সমৃদ্ধি প্রাপ্তির ফলে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে এবং এভাবে যেন আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পথে ফিরে আসে। কিন্তু কর্মবিমুখ, শৈথিল্যপরায়ণের দল তাতেও সতর্ক হয়নি, বরং বলতে শুরু করে দেয় যে, وَقَالُوا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ অর্থাৎ এটা কোন নতুন বিষয় নয়, সৎ কিংবা অসৎ কর্মের পরিণতিও নয়, বরং প্রকৃতির নিয়মই তাই, কখনও সুখ, কখনও দুঃখ কখনও রোগ, কখনও স্বাস্থ্য, কখনও দারিদ্র্য, কখনও সচ্ছলতা---এমনই হয়ে থাকে। আমাদের পিতা-পিতামহ প্রমুখ পূর্ব-পুরুষেরও এমনি সব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

সারকথা, প্রথম পরীক্ষাটি নেয়া হয়েছে বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমে। তাতে তারাও অকৃতকার্য হয়েছে। আর দ্বিতীয় পরীক্ষাটি নেয়া হল, আরাম-আয়েশ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং ধন-সম্পদের প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে। কিন্তু তাতেও তারা তেমনি অকৃতকার্য রয়ে গেল। কোনমতেই নিজেদের পথভ্রষ্টতা থেকে ফিরে এলো না। আর তখনই ধরা পড়লো আকস্মিক আযাবের মধ্যে। اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ بَغْتَةً (বাগ্‌তাতান) হঠাৎ, সহসা বা অকস্মাৎ। তার অর্থ---যখন তারা উভয় পরীক্ষাতেই অকৃতকার্য হয়ে গেল এবং সতর্ক হলো না, তখন আমি তাদের আকস্মিক আযাবের মাধ্যম ধরে ফেললাম এবং এ ব্যাপারে তাদের কোন খবরই ছিল না।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছেঃ وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

অর্থাৎ সে জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং নাফরমানী থেকে বিরত থাকত তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও যমীনের সমস্ত বরকতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা যখন মিথ্যারোপ করেছে তখন আমি তাদের তাদেরই কৃতকর্মের দরুন পাকড়াও করেছি।

বরকতের শাব্দিক অর্থ প্রবৃদ্ধি। আসমান ও যমীনের সমস্ত বরকত খুলে দেওয়া বলতে উদ্দেশ্য হল সব রকম কল্যাণ সবদিক থেকে খুলে দেওয়া অর্থাৎ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক সময়ে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হত আর যমীন থেকে যে কোন বস্তু তাদের মনোমত উৎপাদিত হত এবং অতপর সেসব বস্তু দ্বারা তাদের লাভবান হওয়ার এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দেওয়া হত। তাতে তাদেরকে এমন কোন

চিন্তা-ভাবনা কিংবা টানাপড়েনের সম্মুখীন হতে হত না, যার দরুন বড় বড় নিয়ামতও পঙ্কিলতাপূর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে তাদের প্রতিটি বিষয়ে বরকত বা প্রবৃদ্ধি ঘটত।

পৃথিবীতে বরকতের বিকাশ ঘটে দু'রকমে। কখনও মূল বস্তুটি প্রকৃতভাবেই বেড়ে যায়। যেমন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মু'জিযাসমূহের মধ্যে রয়েছে, একটা সাধারণ পাত্রের পানি দ্বারা গোটা কাফেলার পরিতৃপ্ত হওয়া কিংবা সামান্য খাদ্যদ্রব্যে বিরাট সমাবেশের পূর্ণোদর খাওয়া, যা সঠিক ও বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে। আবার কোন কোন সময় মূল বস্তুতে বাহ্যত কোন বরকত বা প্রবৃদ্ধি যদিও হয় না, পরিমাণ যা ছিল তাই থেকে যায়, কিন্তু তার দ্বারা এত বেশি কাজ হয় যা এমন দ্বিগুণ-চতুর্গুণ বস্তুর দ্বারাও সাধারণত সম্ভব হয় না। তাছাড়া সাধারণভাবেও দেখা যায় যে, কোন একটা পাত্র কাপড়-চোপড় কিংবা ঘরদোর অথবা ঘরের অন্য কোন আসবাবপত্র এমন বরকতময় হয় যে, মানুষ তাতে আজীবন উপকৃত হওয়ার পরেও তা তেমনি বিদ্যমান থেকে যায়। পক্ষান্তরে অনেক জিনিস তৈরী করার সময়ই ভেঙে বিনষ্ট হয়ে যায় কিংবা অটুট থাকলেও তার দ্বারা উপকার লাভের কোন সুযোগ আসে না অথবা উপকারে আসলেও তাতে পরিপূর্ণ উপকৃত হওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না।

এই বরকত মানুষের ধন-সম্পদেও হতে পারে, মন-মস্তিষ্কেও হতে পারে, আবার কাজকর্মেও হতে পারে। কোন কোন সময় মাত্র এক গ্রাস খাদ্যও মানুষের জন্য পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের কারণ হয়। আবার কোন কোন সময় অতি উত্তম পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য বা ওষুধও কোন কাজে আসে না। তেমনিভাবে কোন সময়ের মধ্যে বরকত হলে মাত্র এক ঘন্টা সময়ে এত অধিক কাজ করা যায়, যা অন্য সময় চার ঘন্টায়ও করা যায় না। বস্তুত এসব ক্ষেত্রে পরিমাণের দিক দিয়ে সম্পদ বা সময় বাড়ে না সত্য, কিন্তু এমনি বরকত তাতে প্রকাশ পায় যাতে কাজ হয় বহু গুণ বেশি।

এ আয়াতের দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আসমান ও যমীনের সমস্ত সৃষ্টি ও বস্তুরাজির বরকত ঈমান ও পরহিযগারীর উপরই নির্ভরশীল। ঈমান ও পরহিযগারীর পথ অবলম্বন করলে আখিরাতের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার কল্যাণ এবং বরকতও লাভ হয়। পক্ষান্তরে ঈমান ও পরহিযগারী পরিহার করলে সেগুলোর কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত হতে হয়, বর্তমান বিশ্বের যে অবস্থা সেদিকে লক্ষ্য করলে বিষয়টি বাস্তব সত্য হয়ে সামনে এসে যায়। এখন বাহ্যিক দিক দিয়ে জমির উৎপাদন পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি। তাছাড়া ব্যবহার্য দ্রব্যাদির আধিক্য এবং নতুন নতুন আবিষ্কার এত বেশি যা পূর্ববর্তী বংশধরেরা ধারণা বা কল্পনাও করতে পারত না। কিন্তু এ সমুদয় বস্তু-উপকরণের প্রাচুর্য ও আধিক্য সত্ত্বেও আজকের মানুষকে নিতান্তই হতবুদ্ধি, রুগ্ন ও দারিদ্র্য-পীড়িত দেখা যায়। সুখ ও শান্তি কিংবা মানসিক প্রশান্তির অস্তিত্ব কোথাও নেই। এর কারণ এ ছাড়া আর কি বলা বলা যায় যে, উপকরণ সবই বর্তমান এবং প্রচুর পরিমাণেই বর্তমান, কিন্তু এ সবের মধ্যে যে বরকত ছিল তা শেষ হয়ে গেছে?

এক্ষেত্রে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, সূরা আন'আমের এক আয়াতে কাফির ও দুরাচারদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ যখন তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশসমূহে বিস্মৃত হয়ে গেছে, তখন আমি তাদের উপর যাবতীয় বিষয়ের দরজাসমূহ খুলে দিয়েছি এবং অতপর আকস্মিক-ভাবে তাদেরকে আযাবে নিপতিত করেছি। এতে বোঝা যায়, পৃথিবীতে কারো জন্য সব বিষয়ের দরজা খুলে যাওয়াটা প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র অনুগ্রহই নয়; বরং তা আল্লাহ্‌র এক প্রকার গযবও হতে পারে। আর এখানে বলা হয়েছে যে, যদি তারা ঈমান ও পরহিযগারী অবলম্বন করত, তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। এতে বোঝা যায় যে, আসমান ও যমীনের বরকত লাভ করতে পারা আল্লাহ্‌র দান ও সন্তুষ্টির পরিচায়ক।

কথা হলো এই যে, পৃথিবীর বরকত ও নিয়ামতসমূহ কখনও পাপাচার ও ঔদ্ধত্যের সীমা অতিক্রম করার পর মানুষের পাপকে অধিকতর স্পষ্ট করে তোলার উদ্দেশ্যে দেয়া হয়ে থাকে এবং তা একান্তই সাময়িক হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তা গযব ও অভিশাপেরই লক্ষণ। আবার কখনও এই নিয়ামত ও বরকত আল্লাহ্‌র দান এবং রহমত হিসাবে স্থায়ী কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য হয়ে থাকে। তখন তা হয় ঈমান ও পরহিযগারীর ফল। বাহ্যিক আকারের দিক দিয়ে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ পরিণতি ও ভবিতব্য সম্পর্কে কারোই কিছু জানা নেই। তবে যাঁরা আল্লাহ্‌র ওলী, তাঁরা লক্ষণ-নিদর্শনের আলোকে এরূপ পরিচয় ব্যক্ত করেছেন যে, যখন ধন-সম্পদ এবং আরাম-আয়েশের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া ও ইবাদতের অধিকতর তৌফিক লাভ হয়, তখনই বোঝা যায় যে, এটা রহমত। আর যদি ধন-সম্পদ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অমনোযোগ এবং পাপাচার বৃদ্ধি পায়, তাহলে তা আল্লাহ্‌র গযবের লক্ষণ। আমরা তা থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি।

চতুর্থ আয়াতে পুনরায় পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন যে, সেই জনপদের অধিবাসীরা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, আমার আযাব এমনি অবস্থায় এসে আঘাত করবে, যখন হয়ত তারা রাতের নিদ্রায় মগ্ন থাকবে? তাছাড়া এই জনপদবাসীরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে যে, আযাব তাদেরকে এমন অবস্থায় এসে আঘাত করে বসবে, যখন তারা মধ্য-দিবসে খেলাধুলায় মত্ত থাকবে। এরা কি আল্লাহ্‌র অদৃশ্য ব্যবস্থা ও নিয়তির ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে? তাহলে যথার্থই জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র সে অদৃশ্য ব্যবস্থা ও নিয়তির ব্যাপারে সে জাতিই কেবল নিশ্চিন্ত হতে পারে, যারা অনিবার্যভাবেই সর্বনাশের সম্মুখীন।

সারমর্ম হলো এই যে, এসব লোক যারা দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে উন্মত্ত হয়ে আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে, তাদের এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয় যে, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র আযাব রাতে কিংবা দিনের বেলায় যে কোন অবস্থায় এসে যেতে পারে। যেমন বিগত জাতিসমূহের প্রতি অবতীর্ণ আযাবের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। বুদ্ধিমানদের কাজ হচ্ছে অন্যের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং যেসব কাজ অন্যের জন্য ধ্বংসের কারণ হয়েছে সেসব কাজের ধারে-কাছেও না যাওয়া !

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَّوْ نَشَاءُ
أَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾
تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآئِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ۚ كَذٰلِكَ
يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِ الْكٰفِرِينَ ﴿١٠١﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ
وَإِنْ وَّجَدْنَآ أَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِينَ ﴿١٠٢﴾

(১০০) তাদের নিকট কি এ কথা প্রকাশিত হয়নি, যারা উত্তরাধিকার লাভ করেছে? সেখানকার লোকদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার পর যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবে তাদেরকে তাদের পাপের দরুন পাকড়াও করে ফেলতাম। বস্তুত আমি মোহর এঁটে দিয়েছি তাদের অন্তরসমূহের উপর। কাজেই এরা শুনতে পায় না। (১০১) এগুলো হল সেসব জনপদ, যার কিছু বিবরণ আমি আপনাকে অবহিত করছি। আর নিশ্চিতই ওদের কাছে পৌঁছেছিলেন রসূল নিদর্শন সহকারে। অতপর কস্মিনকালেও এরা ঈমান আনবার ছিল না, তারপরে যা তারা ইতিপূর্বে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করেছে। এভাবেই আল্লাহ্ কাফিরদের অন্তরে মোহর এঁটে দেন। (১০২) আর তাদের অধিকাংশ লোক-কেই আমি প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নকারীরূপে পাইনি, বরং তাদের অধিকাংশকে পেয়েছি হুকুম অমান্যকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তাদের পক্ষে আযাবকে কেন ভয় করতে হবে---অতপর তারই কারণ বাতলে দেওয়া হচ্ছে। আর সে কারণটি হচ্ছে, বিগত উম্মত বা সম্প্রদায়সমূহ যেভাবে কুফর ও শিরকজনিত অপরাধে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদেরও সেই একই পথ অবলম্বন করা। অর্থাৎ) আর (বিগত) সে জনপদে বসবাসকারীদের পরে যারা (এখন) তাদের

স্থলে জনপদে বসবাস করে, উল্লিখিত ঘটনাবলী কি তাদেরকে এ বিষয়ে (এখনও) বলে দেয়নি যে, আমি যদি ইচ্ছা করতাম, তাহলে তাদেরকে (-ও বিগত উম্মতগুলোর মতই) তাদের (কুফর ও মিথ্যারোপজনিত) অপরাধের দরুন ধ্বংস করে দিতাম। (কেননা বিগত উম্মতগুলোকে এসব অপরাধের জন্যই ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।) আর (এসব ঘটনা বাস্তবিকই শিক্ষা গ্রহণ করার মতই ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে) আমি তাদের অন্তরসমূহের উপর বাঁধন এঁটে দিয়েছি। এতে তারা (সত্য বিষয়কে অন্তর দিয়ে) শুনতে (-ও) পায় না স্বীকার তো দূরের কথা। এই বাঁধনের দরুন তাদের কঠোরতা এমনি বেড়ে গেছে যে, এমনসব শিক্ষণীয় ঘটনার দ্বারাও তাদের শিক্ষা হয় না। আর এই বাঁধন আঁটার কারণ হলো তাদেরই অতীত কুফরী কার্যকলাপ। যেমন, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ —এরপরে হয়তো রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সান্ত্বনার উদ্দেশ্যে উল্লিখিত সমগ্র বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ রূপে বলা হয়েছে যে, উল্লিখিত সেই জনপদসমূহের কিছু কিছু কাহিনী আপনাকে বলে দিচ্ছি। সেই (জনপদের অধিবাসীদের) সবার নিকট তাদের পয়গম্বররা মু'জিযা (অলৌলিক নিদর্শনসমূহ) নিয়ে এসেছিলেন (কিন্তু) তবু (তাদের একগুঁয়েমি ও হঠকারিতার এমনি অবস্থা ছিল যে,) যে বিষয়কে তারা প্রথম (ধরে)-ই (একবার) মিথ্যা বলে দিয়েছে, এমনটি আর হয়নি যে, পরে তা মেনে নেবে। (তাছাড়া যেমনি এরা অন্তরের দিক দিয়ে কঠিন ছিল) আল্লাহ্ও তেমনিভাবে কাফিরদের অন্তরে বাঁধন এঁটে দেন। আর (তাদের মধ্যে কোন কোন লোক বিপদের মধ্যে ঈমান গ্রহণের প্রতিজ্ঞাও করে নিত। কিন্তু) অধিকাংশ লোকের মধ্যেই আমি প্রতিজ্ঞা পালন করতে দেখিনি। (অর্থাৎ বিপদমুক্তির পরই আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যেত।) আর আমি অধিকাংশ সে লোককে (নবী-রসূল প্রেরণ, মু'জিযা প্রকাশ, নিদর্শনসমূহ অবতারণ এবং কৃত ওয়াদা বা চুক্তিসমূহের সম্পাদন সত্ত্বেও নির্দেশ অমান্যকারীই পেয়েছি। বস্তুত কাফিররা চিরকাল এমনি হয়ে আসছে; তাতে আপনিও দুঃখ করবেন না।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতসমূহেও বিগত জাতিসমূহের ঘটনাবলী এবং অবস্থার কথা শুনিয়ে বর্তমান আরব-আজমের সমস্ত জাতিকে এ বিষয় বাতলে দেওয়াই উদ্দেশ্য যে, এসব ঘটনায় তোমাদের জন্য বিরাট শিক্ষণীয় সতর্কবাণী রয়ে গেছে। যেসব কর্মের ফলে বিগত দিনের লোকদের উপর আল্লাহ্র গযব ও আযাব নাযিল হয়েছে সেগুলোর কাছেও যাবে না। আর যেসব কর্মের দরুন নবী-রসূল (আ) ও তাঁদের অনুসারীরা সাফল্য লাভ করেছেন সেগুলো অবলম্বন করবে। প্রথম আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে—

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ

يهدى ، هدى অর্থ চিহ্নিতকরণ এবং বাতলে দেওয়া। এখানে এর কর্তা হল সে সমস্ত ঘটনাবলী যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান যুগের লোকেরা যারা অতীত জাতিসমূহের ধ্বংসের পরে তাদের ভূসম্পত্তি ও ঘরবাড়ির উত্তরাধিকারী হয়েছে, কিংবা পরে হবে, তাদেরকে শিক্ষণীয় সেসব অতীত ঘটনাবলী একথা বাতলে দেয়নি যে, কুফরী ও অস্বীকৃতি এবং আল্লাহ্‌র বিধানের বিরোধিতার পরিণতিতে যেভাবে তাদের পূর্বপুরুষেরা (অর্থাৎ বিগত জাতিসমূহ) ধ্বংস ও বিধ্বস্ত হয়ে গেছে তেমনিভাবে তারাও যদি অনুরূপ অপরাধে লিপ্ত থাকে, তাহলে তাদের উপরও আল্লাহ্ তা'আলার আযাব ও গযব আসতে পারে।

অতপর বলা হয়েছে ঃ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ طبع শব্দের অর্থ ছাপা এবং মোহর লাগানো। তার মানে, এরা অতীত ঘটনাবলী থেকেও কোন রকম শিক্ষা গ্রহণ করে না। ফলে আল্লাহ্‌র গযবের দরুন তাদের অন্তরে মোহর এঁটে যায়; তারা তখন কিছু শুনতে পায় না। হাদীসে মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন যে, কোন লোক যখন প্রথম প্রথম পাপ কাজ করে, তখন তার অন্তরে কালির একটা বিন্দু লেগে যায়। দ্বিতীয়বার পাপ করলে দ্বিতীয় বিন্দু লাগে আর তৃতীয়বার পাপ করলে তৃতীয় বিন্দুটি লেগে যায়। এমনকি সে যদি অনবরত পাপের পথে অগ্রসর হতে থাকে; তওবা না করে, তাহলে এই কালির বিন্দু তার সমগ্র অন্তরকে ঘিরে ফেলে ও মানুষের অন্তরে ভাল-মন্দকে চেনার এবং মন্দ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যে স্বাভাবিক যোগ্যতাটি দিয়ে রেখেছেন, তা হয় নিঃশেষিত, না হয় পরাভূত হয়ে যায়। আর তখন তার ফল দাঁড়ায় এই যে, সে ভালকে মন্দ; মন্দকে ভাল এবং ইষ্টকে অনিষ্ট, অনিষ্টকে ইষ্ট বলে ধারণা করতে আরম্ভ করে। এ অবস্থাটিকেই কোরআনে ران অর্থাৎ অন্তরের মরচে বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর এ অবস্থার সর্বশেষ পরিণতিকেই আলোচ্য আয়াতে এবং আরও বহু আয়াতে طبع অর্থাৎ মোহর এঁটে দেয়া বলা হয়েছে।

এখানে লক্ষণীয় যে, মোহর লেগে যাওয়ার পরিণতি তো জ্ঞান-বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি---কানের দ্বারা শ্রবণের উপর তো তার কোন প্রতিক্রিয়া স্বভাবত হওয়ার কথা নয়। কাজেই উক্ত আয়াতের এ স্থানটিতে فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ অর্থাৎ 'তারা বোঝে না' বলাই সমীচীন ছিল। কিন্তু কোরআনে-করীমে এ ক্ষেত্রে বলা হয়েছে فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ অর্থাৎ তারা শোনে না। এর কারণ হলো এই যে, এখানে শোনা অর্থ মান্য করা এবং অনুসরণ করা, যা বোঝা বা উপলব্ধি করারই ফল। কাজেই প্রকৃত মর্ম দাঁড়ায় এই যে, অন্তরে মোহর এঁটে যাবার দরুন তারা কোন সত্য ও ন্যায় বিষয়কে মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ হয় না। তাছাড়া এও বলা যেতে পারে যে, মানুষের অন্তর হল তার

সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অনুভূতিসমূহের কেন্দ্র। অন্তরের ক্রিয়ায় যখন কোন রকম গোলযোগ দেখা দেয়, তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যাবতীয় কার্যকলাপও গোলযোগপূর্ণ হয়ে যায়। অন্তরে যখন কোন বিষয়ের ভাল কিংবা মন্দ বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন চোখেও তাই দেখা যায় এবং কানেও তাই শোনা যায়।

দ্বিতীয় আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :— تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَا

এখানে انباء শব্দটি نبأ-এর বহুবচন। যার অর্থ কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। অর্থাৎ বিধ্বস্ত জনপদসমূহের কোন কোন ঘটনা আপনাকে বলছি। এখানে مِنْ বিশেষণের মাধ্যমে ইঙ্গিত করে দেয়া হয়েছে যে, অতীত জাতিসমূহের যে ঘটনাবলী আলোচনা করা হলো, এগুলোই শেষ নয় বরং এমন হাজারো ঘটনার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা মাত্র।

অতপর বলা হয়েছে : وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا

لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ এসব লোকদের প্রতি প্রেরিত নবী ও রসূলরা তাদের কাছে মু'জিযা (অলৌকিক নিদর্শন)-সমূহ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, যার দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মীমাংসা হয়ে যায়, কিন্তু তাদের একগুঁয়েমি ও হঠকারিতার এমনি অবস্থা ছিল যে, যে বিষয় সম্পর্কে একবার তাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়তো যে, এটা ভুল এবং মিথ্যা, তখন আর সে বিষয়ের যথার্থতা ও সত্যতার পক্ষে যতই মু'জিযা এবং দলীল-প্রমাণ উপস্থিত হোক না কেন, কিছুতেই তারা আর তাকে বিশ্বাস ও স্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ হতো না।

এ আয়াতের দ্বারা একটা বিষয় এই জানা গেল যে, সমস্ত নবী-রসূলকেই মু'জিযা দান করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে কোন নবী (আ)-এর মু'জিযার আলোচনা কোরআনে এসেছে, অনেকের আসেওনি। এতে এমন কোন ধারণা করা যথার্থ হতে পারে না যে, যাদের মু'জিযার বিষয় কোরআনে আলোচিত হয়নি, আদৌ তাদের কোন মু'জিযাই ছিল না। আর সূরা হূদ-এ হযরত হূদ (আ)-এর সম্প্রদায় সম্পর্কে এই কথা উল্লিখিত হয়েছে : مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ অর্থাৎ আপনি কোন মু'জিযা উপস্থিত করেননি—এই আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, তাদের এ উক্তিটি ছিল শুধুমাত্র হঠকারিতা ও একগুঁয়েমি, কিংবা তাঁর মু'জিযাগুলোকে তারা তুচ্ছজ্ঞান করে এ কথা বলেছিল।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এ আয়াতে তাদের যে অবস্থার কথা বলা হয়েছে যে, কোন ভুল কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলে তারা তাই পালন করত ; তার

বিপরীতে যতই প্রকৃষ্ট দলীল-প্রমাণ আসুক না কেন তারা নিজের ধ্যান-ধারণায় অটল থাকত। আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ও কাফির জাতিসমূহের এমনি অবস্থা। বহু মুসলমান এমনকি আলিম-ওলামা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও এ ব্যাধিতে ভুগছেন। প্রথম ধাক্কায় একবার কোন বিষয়কে মিথ্যা বা ভুল বলে উচ্চারণ করে ফেললে পরে বিষয়টির সত্যতার হাজারো প্রমাণ উপস্থাপিত হলেও তাঁরা নিজের সে ধারণারই অনুসরণ করতে থাকেন। সূফীতত্ত্ব মতে এ অবস্থাটি আল্লাহ্‌র গযবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অতপর বলা হয়েছে ঃ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ অর্থাৎ যেভাবে তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেওয়া হয়েছে, তেমনিভাবে সাধারণ কাফির ও নাস্তিকদের অন্তরেও আল্লাহ্ মোহর এঁটে দিয়ে থাকেন, যাতে সততা বা নেকী অবলম্বনের যোগ্যতা অবশিষ্ট না থাকে।

তৃতীয় আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ অর্থাৎ তাদের মধ্যে অধিকাংশকেই আমি প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী রূপে পাইনি।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, ওয়াদা বা প্রতিজ্ঞা বলতে عهد الست (আহ্‌দে-আলাস্ত) বোঝানো হয়েছে—যা সৃষ্টির আদিলগ্নে সমস্ত সৃষ্টির জন্মের পূর্বে যখন তাদের আত্মাগুলোকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তখন আল্লাহ্ সেগুলোর কাছ থেকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ অর্থাৎ আমি কি তোমাদের পরওয়ারদিগার নই? তখন সমস্ত রূহ্ বা মানবাত্মা প্রতিজ্ঞা ও স্বীকৃতি-স্বরূপ উত্তর দিয়েছিল بَلٰى অর্থাৎ নিশ্চয়ই আপনি আমাদের পরওয়ারদিগার। কিন্তু পৃথিবীতে আসার পর অধিকাংশ লোকই সে প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেছে। আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে সৃষ্টবস্তুর পূজার অভিশাপে জড়িয়ে পড়েছে। সে জন্যই এ আয়াতে আমি তাদের মধ্যে অধিকাংশকেই নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল পাইনি। অথাৎ ওয়াদা পূরণে তাদেরকে যথাযথ পাইনি।----(কবীর)

আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) বলেছেন, 'ওয়াদা' বলতে ঈমানের ওয়াদা বোঝানো উদ্দেশ্য। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا এক্ষেত্রে 'আহ্‌দ' বা প্রতিজ্ঞা অর্থ ঈমান ও আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা। কাজেই আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, তাদের অধিকাংশই আমার সাথে ঈমান ও আনু-

গত্যের প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু পরে তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে। প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হওয়া অর্থ হলো এই যে, সাধারণত মানুষ যখন কোন বিপদের সম্মুখীন হয়, যত মন্দ লোকই হোক না কেন, তখন সে একমাত্র আল্লাহ্‌কেই স্মরণ করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনে বা মুখে এমন প্রতিজ্ঞা করে নেয় যে, বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে গেলে আল্লাহ্‌র আনুগত্য এবং উপাসনায় আত্মনিয়োগ করব, নাফরমানী বা অন্যায় থেকে বেঁচে থাকব। যেমন, কোরআন মজীদেও এমনি বহু লোকের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তারা বিপদমুক্ত হয়ে যখন শান্তি ও স্থিতিশীলতায় ফিরে আসে, তখন আবার রিপুজনিত কামনা-বাসনায় জড়িয়ে পড়ে এবং কৃত ওয়াদা বা প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যায়।

উল্লিখিত আয়াতের أَكْثَر শব্দটি দ্বারা সেদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা বহু লোক এমন হতভাগাও রয়েছে যে, বিপদের সময়েও এরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে না, তখনও এরা ঈমান ও আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা করে না। কাজেই তাদের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অভিযোগের কোন মানেই হয় না। আর এমনও অনেক লোক রয়েছে, যারা প্রতিজ্ঞাও পূরণ করে এবং ঈমান ও আনুগত্যের দাবিও সম্পাদন করে। কাছেই বলা হয়েছে ঃ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ অর্থাৎ তাদের মধ্যে অধিকাংশকে প্রতিজ্ঞা পূরণকারী পাইনি।

তারপর বলা হয়েছে ঃ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ অর্থাৎ আমি তাদের মধ্যে অধিকাংশকে শ্রদ্ধা ও আনুগত্য থেকে বিমুখ পেয়েছি।

এ পর্যন্ত অতীতের নবী-রসূল (আ) এবং তাঁদের জাতি ও সম্প্রদায়ের পাঁচটি ঘটনা বিবৃত করার মাধ্যমে বর্তমান উম্মতকে সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণের তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

অতপর ষষ্ঠ ঘটনাটিতে হযরত মসা (আ) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এতে প্রসঙ্গক্রমে বহু হুকুম-আহকাম, মাস'আলা-মাসায়েল এবং শিক্ষা ও উপদেশ সংক্রান্ত বিচিত্র বিষয় রয়েছে। সে জন্যই কোরআন করীমে এ ঘটনার অংশবিশেষ বার বার পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا
بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٣﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ
إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا

الْحَقَّ ۖ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ ﴿١٠٥﴾
قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِـَٔايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ الصَّـٰدِقِينَ ﴿١٠٦﴾
فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٧﴾ وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِىَ بَيْضَآءُ
لِلنَّـٰظِرِينَ ﴿١٠٨﴾ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَـٰذَا لَسَـٰحِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾
يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾

(১০৩) অতপর আমি তাঁদের পরে মূসাকে পাঠিয়েছি নিদর্শনাবলী দিয়ে ফিরাউন ও তার সভাসদদের নিকট। বস্তুত ওরা তাঁর মুকাবিলায় কুফরী করেছে। সুতরাং চেয়ে দেখ, কি পরিণতি হয়েছে অনাচারীদের। (১০৪) আর মূসা বললেন, হে ফিরাউন, আমি বিশ্ব-পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত রসূল। (১০৫) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে সত্য এসেছে তার ব্যতিক্রম কিছু না বলার ব্যাপারে আমি সুদৃঢ়। আমি তোমাদের পরওয়ারদিগারের নিদর্শন নিয়ে এসেছি! সুতরাং তুমি বনী ইসরাঈলদের আমার সাথে পাঠিয়ে দাও। (১০৬) সে বলল, যদি তুমি কোন নিদর্শন নিয়ে এসে থাক, তাহলে তা উপস্থিত কর যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক। (১০৭) তখন তিনি নিক্ষেপ করলেন নিজের লাঠিখানা এবং তৎক্ষণাৎ তা জলজ্যান্ত এক অজগরে রূপান্তরিত হয়ে গেল। (১০৮) আর বের করলেন নিজের হাত এবং তা সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের চোখে ধবধবে উজ্জ্বল দেখাতে লাগল। (১০৯) ফিরাউনের সাঙ্গপাঙ্গরা বলতে লাগল, নিশ্চয় লোকটি বিজ্ঞ যাদুকর। (১১০) সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়। এ ব্যাপারে তোমাদের কি মত?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতপর (উল্লিখিত) সেই নবী-রসূলদের পরে আমি (হযরত) মূসা (আ)-কে স্বীয় নিদর্শনরাজি (অর্থাৎ মু'জিযাসমূহ) দিয়ে ফিরাউন এবং তার পারিষদবর্গের নিকট (তাদের হিদায়ত ও পথ-প্রদর্শনকল্পে) পাঠালাম। অতএব, [মূসা (আ) যখন সেসব নিদর্শন প্রকাশ করলেন, তখন] তারা সেই (মু'জিযা)-সমুদয়ের হক একেবারেই আদায় করল না। কেননা (সেগুলোর হক ও চাহিদা ছিল ঈমান গ্রহণ করা।) কাজেই দেখুন, সেই দুষ্কৃতকারীদের কেমন (দুর্ভাগ্যজনক) পরিণতি ঘটেছে। (যেমন, কোরআনের অন্যত্র তাদের ডুবে মরার কথা আলোচিত হয়েছে। এগুলো ছিল পূর্ণ কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। অতপর তারই বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ) আর মূসা (আ) আল্লাহ্‌র হুকুম মুতাবিক ফিরাউনের নিকট গিয়ে বললেন, আমি

রব্বুল-আলামীনের পক্ষ থেকে (তোমাদের হিদায়তের উদ্দেশ্যে) রসূল (নিযুক্ত) হয়ে এসেছি। (যে আমাকে মিথ্যা বলে অভিহিত করবে, তা ভুল। কারণ,) আমার পক্ষে সত্য ব্যতীত কোন কিছু আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করা শোভন নয়। (তাছাড়া রসূল হওয়ার ব্যাপারে আমার দাবি শূন্যগর্ভ নয়, বরং) আমি তোমাদের কাছে তোমাদের পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে একটি বিরাট নিদর্শন ও (মু'জিযা) এনেছি (যা তোমরা চাইলেই দেখাতে পারি)। কাজেই (আমি যখন প্রমাণসহ আগমনকারী রসূল, তখন আমি যা বলি তোমরা তা অনুসরণ কর। বস্তুত আমার বলার মধ্যে একটা হল এই যে,) তুমি বনী-ইসরাঈল সম্প্রদায়কে (দাসত্বের নিগড় থেকে অব্যাহতি দিয়ে) আমার সাথে (তাদের আসল দেশ শামে) পাঠিয়ে দাও। ফিরাউন বলল, আপনি যদি (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) কোনও মু'জিযা নিয়ে এসে থাকেন, তাহলে তা উপস্থাপন করুন; যদি আপনি (এ দাবিতে) সত্যবাদী হয়ে থাকেন। তিনি (তৎক্ষণাৎ) স্বীয় লাঠিখানা (মাটিতে) ফেলে দিলেন; আর সহসাই তা সুস্পষ্ট এক অজগরে পরিণত হয়ে গেল। (যার অজগর হওয়ার ব্যাপারে কারও কোন সন্দেহ হওয়ার মতো কোন অবকাশ ছিল না।) আর (দ্বিতীয় মু'জিযাটি প্রকাশ করলেন এই যে,) স্বীয় হাত (জামার ভিতরে নিয়ে বগলতলায় দাবিয়ে) বাইরে বের করে আনলেন; আর অমনি তা সমস্ত দর্শকের সামনে অত্যন্ত প্রদীপ্ত হয়ে উঠল এমনিভাবে যে, তাও সবাই দেখল। হযরত মূসা (আ)-এর এসব সুস্পষ্ট মু'জিযা যখন প্রকাশিত হল, তখন ফিরাউন তার পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বলল, এ লোক বড় যাদুকর। নিজ যাদুর বলে তোমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে এখানকার কর্তা হয়ে বসা এবং তোমাদের এখানে থাকতে না দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। অতএব এ ব্যাপারে তোমাদের মতামত কি? সূরা শো'আরায় ফিরাউনের এ কথাটি উদ্ধৃত রয়েছে। যা হোক, রাজা-বাদশাহদের চাটুকারবর্গের যেমন স্বভাব হয়ে থাকে হ্যাঁ-এর সাথে হ্যাঁ মিলিয়ে দেওয়া, তেমনিভাবে (ফিরাউনের কথার সমর্থন ও সত্যায়নের জন্য) ফিরাউনের সম্প্রদায়ের যেসব সর্দার (ও পারিষদবর্গ সেখানে) উপস্থিত ছিল, তারা (একে অন্যের সাথে) বলল, বাস্তবিকই (স্বীয় যাদু বলে বনী ইসরাঈলসহ তিনি নিজে কর্তা হয়ে বসবেন এবং) তোমাদেরকে (বনী ইসরাঈলদের দৃষ্টিতে তোমাদের হীনতার দরুন) তোমাদের (এই) আবাসভূমি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারেন। কাজেই তোমরা (বাদশাহ যা জিজ্ঞেস করলেন, সে ব্যাপারে) কি পরামর্শ দাও?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই সূরায় নবী-রসূল এবং তাঁদের জাতি ও সম্প্রদায় সম্পর্কে যত কাহিনী ও ঘটনাবলী আলোচনা করা হয়েছে, এ হল সেগুলোর মধ্যে ষষ্ঠ কাহিনী। এখানে এ কাহিনীটি বেশি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার কারণ এই যে, হযরত মূসা (আ)-র মু'জিযাসমূহ বিগত অন্য নবী-রসূলদের তুলনায় যেমন সংখ্যায় বেশি, তেমনিভাবে প্রকাশের বলিষ্ঠতার দিক দিয়েও অধিক। এমনিভাবে তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলেন মূর্খতা এবং হঠকারিতাও বিগত উম্মত বা জাতিসমূহের তুলনায় বেশি

কঠিন। তদুপরি এই কাহিনীর আলোচনা প্রসঙ্গে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ও হুকুম-আহকামের কথা এসেছে।

প্রথম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, তাঁদের পরে অর্থাৎ হযরত নূহ, হূদ, সালেহ, লূত ও শোয়াইব (আ)-এর বা তাঁদের জাতি ও সম্প্রদায়ের পরে আমি হযরত মূসা (আ)-কে আমার নিদর্শনসহ ফিরাউন ও তার জাতির প্রতি পাঠিয়েছি। নিদর্শন বা 'আয়াত' বলতে আসমানী কিতাব তাওরাতের আয়াতও হতে পারে, কিংবা হযরত মূসা (আ)-র মু'জিযাসমূহও হতে পারে। আর সে যুগে 'ফিরাউন' হতো মিসরের সম্রাটের খেতাব। হযরত মূসা (আ)-র সময়ে যে ফিরাউন ছিল তার নাম 'কাবুস' বলে উল্লেখ করা হয়। —(কুরতুবী)।

فَظَلَمُوا بِهَا —এর যে সর্বনাম তার লক্ষ্য হল নিদর্শন। অর্থাৎ তারা আয়াত বা নিদর্শনসমূহের প্রতি জুলুম করেছে। আর আল্লাহ্‌র আয়াত বা নিদর্শনের প্রতি জুলুম করার অর্থ হল এই যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত বা নিদর্শনের কোন মর্যাদা বোঝেনি। সেগুলোর শুকরিয়া আদায় করার পরিবর্তে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং ঈমানের পরিবর্তে কুফরী অবলম্বন করেছে। কারণ, জুলুম-এর প্রকৃত সংজ্ঞা হচ্ছে কোন বস্তু বা বিষয়কে তার সঠিক স্থান কিংবা সঠিক সময়ের বিপরীতে ব্যবহার করা।

অতপর বলা হয়েছে ঃ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ অর্থাৎ চেয়ে দেখ না, সেই দাঙ্গা-ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের কি পরিণতি ঘটেছে। এর মর্মার্থ এই যে, ওদের দুষ্কর্মের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা কর এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ) ফিরাউনকে বললেন, আমি বিশ্ব-পালক আল্লাহ্ তা'আলার রসূল। আর আমার অবস্থা এই যে, আমার যে নবুয়তী মর্যাদা তার দাবি হলো, যাতে আমি আল্লাহ্‌র প্রতি সত্য ছাড়া কোন বিষয় আরোপ না করি। কারণ, নবী (সা)-দের আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সত্যের যে পয়গাম দান করা হয়, তা তাঁদের কাছে আল্লাহ্‌র আমানত। নিজের পক্ষ থেকে সেগুলোতে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা সবই আমানতের খেয়ানত। পক্ষান্তরে নবী-রসূলরা হলেন খেয়ানত ও যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত —নিষ্পাপ। সারকথা, আমার কথার উপর তোমাদের বিশ্বাস এজন্য স্থাপন করা কর্তব্য যে, আমার সত্যতা তোমাদের সবার সামনে ভাস্বর; আমি কখনও মিথ্যা বলিওনি, বলতে পারিও না। তাছাড়া قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ অর্থাৎ শুধু তাই নয় যে, আমি কখনও মিথ্যা বলিনি; বরং আমার দাবির সপক্ষে আমার

মু'জিযাসমূহও প্রমাণ হিসাবে রয়েছে। সুতরাং এসব বিষয়ের প্রেক্ষিতে তোমরা আমার কথা শোন, আমার কথা মান। বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়কে অন্যায় দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে আমার সাথে দিয়ে দাও। কিন্তু ফিরাউন অন্য কোন কথাই লক্ষ্য করল না; মু'জিযা দেখাবার দাবি করতে লাগল এবং বলল ঃ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ অর্থাৎ বাস্তবিকই যদি তুমি কোন মু'জিযা নিয়ে এসে থাক, তাহলে তা উপস্থাপন কর যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক।

হযরত মূসা (আ) তার দাবি মেনে নিয়ে স্বীয় লাঠিখানা মাটিতে ফেলে দিলেন; আর অমনি তা এক বিরাট অজগরে পরিণত হয়ে গেল فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ 'সু'বান' বলা হয় বিরাটকায় অজগরকে। আর তার গুণবাচক مُبِينٌ (মুবীন) শব্দ উল্লেখ করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সে লাঠির সাপ হয়ে যাওয়াটা এমন কোন ঘটনা ছিল না যা অন্ধকারে কিংবা পর্দার আড়ালে ঘটে থাকবে, যা কেউ দেখে থাকবে, কেউ দেখবে না--- সাধারণত যা যাদুকর বা ঐন্দ্রজালিকদের বেলায় ঘটে থাকে। বরং এ ঘটনাটি--- সংঘটিত হল প্রকাশ্য দরবারে, সবার সামনে।

কোন কোন ঐতিহাসিক উদ্ধৃতিতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, সেই অজগর ফিরাউনের প্রতি যখন হা করে মুখ বাড়াল, তখন সে সিংহাসন থেকে লাফিয়ে পড়ে হযরত মূসা (আ)-র শরণাপন্ন হল; আর দরবারের বহু লোক ভয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হল।---(তফসীরে কবীর)

লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া অসম্ভব কোন ব্যাপার নয়, অবশ্য সাধারণ প্রকৃতি বিরুদ্ধ হওয়ার কারণে এটা যে অত্যন্ত বিস্ময়কর, তাতে সন্দেহ নেই। আর মু'জিযা বা কারামতের উদ্দেশ্যও থাকে তাই। যে কাজ সাধারণ মানুষ করতে পারে না তা নবী-রসূলদের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত করে দেওয়া হয় যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে, তাঁদের সঙ্গে কোন ঐশীশক্তি সক্রিয় রয়েছে। কাজেই হযরত মূসা (আ)-র লাঠির সাপ হয়ে যাওয়াটা বিস্ময়কর কিংবা অস্বীকার করার মত কোন বিষয় হতে পারে না।

অতপর বলা হয়েছে ঃ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (নাযউন) অর্থ হচ্ছে কোন একটি বস্তুকে অপর একটি বস্তুর ভিতর থেকে কিছুটা

বল প্রয়োগের মাধ্যমে বের করা অর্থাৎ নিজের হাতটিকে টেনে বের করলেন। এখানে কিসের ভিতর থেকে বের করলেন, তা উল্লেখ করা হয়নি। অন্য আয়াতে দু'টি বস্তুর উল্লেখ রয়েছে। এক স্থানে এসেছে اُدْخُلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ যার অর্থ হলো, স্বীয় হাত গলাবন্ধ কিংবা বগলের নিচে থেকে অর্থাৎ কখনও গলাবন্ধের ভিতরে ঢুকিয়ে হাত বের করলে আবার কখনও বগল তলে দাবিয়ে সেখান থেকে বের করে আনলে এ মু'জিযা প্রকাশ পেত---فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِيْنَ অর্থাৎ সেই হাতটি দর্শকদের সামনে প্রদীপ্ত হতে থাকতো।

بَيْضَاءُ (বাইদাউন্)-এর শাব্দিক অর্থ সাদা। আর হাতের সাদা হয়ে যাওয়াটা কোন সময় শ্বেতি রোগের কারণেও হতে পারে। তাই অন্য এক আয়াতে এক্ষেত্রে مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ শব্দটিও সংযোজিত করে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ হাতের সাদা হয়ে যাওয়াটা কোন উপসর্গের কারণে ছিল না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েতের দ্বারা জানা যায় যে, এ শুভ্রতাও সাধারণ শুভ্রতা ছিল না; বরং তার সঙ্গে এমন দীপ্তিও থাকত, যার ফলে সমগ্র পরিবেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠত! ---(কুরতুবী)

এখানে لِلنّٰظِرِيْنَ দর্শকদের জন্য) কথাটা বাড়িয়ে উল্লিখিত প্রদীপ্তির বিস্ময়-করতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সে দীপ্তি এমন অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ছিল যে, তা দেখার জন্য দর্শকরা এসে সমবেত হতো।

তখন ফিরাউনের দাবিতে হযরত মূসা (আ) দু'টি মু'জিযা প্রদর্শন করেছিলেন। একটি হল লাঠির সাপ হয়ে যাওয়া; আর অপরটি হল হাত গলাবন্ধ কিংবা বগলের নিচে দাবিয়ে বের করে আনলে তার প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠা। প্রথম মু'জিযাটি ছিল বিরোধীদের ভীতি প্রদর্শন করার জন্য আর দ্বিতীয়টি তাদের আকৃষ্ট করে কাছে আনার উদ্দেশ্যে। এতে ইঙ্গিত ছিল যে, মূসা (আ)-র শিক্ষায় একটি হিদায়তের জ্যোতি রয়েছে; আর সেটির অনুসরণ ছিল কল্যাণের কারণ।

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ــ مَلَاٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয় কোন সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী নেতৃবর্গকে বোঝাবার জন্য। অর্থ হচ্ছে এই যে, ফিরাউনের সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এসব মু'জিযা দেখে তাদের সম্প্র-দায়কে লক্ষ্য করে বলল, এ যে বড় পারদর্শী যাদুকর! তার কারণ, فكر هركس

بقدر همت اوست (প্রত্যেকের চিন্তাই তার নিজ যোগ্যতা অনুসারেই হয়ে থাকে)। সে হতভাগারা আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ কুদ্‌রত ও মহিমা সম্পর্কে কি বুঝবে, যারা জীবনভর ফিরাউনকে খোদা আর যাদুকরদের নিজেদের পথপ্রদর্শক মনে করেছে এবং যাদুকরদের ভোজবাজীই দেখে এসেছে! কাজেই তারা এহেন বিস্ময়কর ঘটনা দেখার পর এছাড়া আর কিইবা বলতে পারত যে, এটা একটা মহাযাদু। কিন্তু তারাও এখানে سَاحِرٌ -এর সাথে عَلِيمٌ শব্দটি যোগ করে একথা প্রকাশ করে দিয়েছে যে, হযরত মূসা (আ)-র মু'জিযা সম্পর্কে তাদের মনেও এ অনুভূতি জন্মেছিল যে, এ কাজটি সাধারণ যাদুকরদের কাজ থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন প্রকৃতির। সেজন্যই স্বীকার করে নিয়েছে যে, তিনি বড় পারদর্শী যাদুকর।

মু'জিযা ও যাদুর মধ্যে পার্থক্য ঃ বস্তুত আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্বযুগেই নবী-রসূলদের মু'জিযাসমূহকে এমনি ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন যে, দর্শকবৃন্দ যদি সামান্যও চিন্তা করে আর হঠকারিতা অবলম্বন না করে, তাহলে মু'জিযা ও যাদুর মাঝে যে পার্থক্য তা নিজেরাই বুঝতে পারে। যাদুকররা সাধারণত অপবিত্রতা ও পঙ্কিলতার মধ্যে ডুবে থাকে। পঙ্কিলতা ও অপবিত্রতা যত বেশি হবে, তাদের যাদুও তত বেশি কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা হল নবী-রসূলদের সহজাত অভ্যাস। আর এও একটা পরিষ্কার পার্থক্য যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই নবুয়তের দাবির পর কারও কোন যাদু কার্যকর হয় না।

তাছাড়া বিজ্ঞজনেরা জানেন যে, যাদুর মাধ্যমে যে বিষয় প্রকাশ করা হয়, সেসব মানসিক বিষয়সমূহের আওতাভুক্তই হয়ে থাকে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, সে বিষয়-গুলো সাধারণ মানুষের মাঝে প্রকাশ পায় না; বরং অন্তর্নিহিত থাকে। কাজেই সে মনে করে, একাজটি বাহ্যিক কোন কারণ ছাড়াই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। পক্ষান্তরে মু'জিযাতে বাহ্যিক বা মানসিক কোন বিষয়ের সামান্যতম সংযোগও থাকে না। তা সরাসরি আল্লাহ্‌ তা'আলার কুদরতের কাজ। তাই কোরআন মজীদে এ বিষয়টিকে আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যেমন, وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى —(বরং আল্লাহ্‌ তা'আলাই সে তীর নিক্ষেপ করেছিলেন)।

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, মু'জিযা এবং যাদুর প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিপরীতধর্মী। যারা তত্ত্বজ্ঞ তাদের কাছে এতদুভয়ের মিলে যাওয়ার কোন কারণই নেই। তবে সাধারণ মানুষের কাছে তা মিলে যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা এই বিভ্রান্তিটি দূর করার উদ্দেশ্যে এমন সব বৈশিষ্ট্য স্থাপন করে দিয়েছেন যার ফলে মানুষ ধোঁকা থেকে বেঁচে যেতে পারে।

সারমর্ম এই যে, ফিরাউনের সম্প্রদায়ও হযরত মূসা (আ)-র মু'জিযাকে নিজেদের যাদুকরদের কার্যকলাপ থেকে কিছুটা স্বতন্ত্রই মনে করেছিল। সেজন্যই

একথা বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, এ যে বড় বিজ্ঞ যাদুকর, সাধারণ যাদুকররা যে এমন কাজ দেখাতে পারে না!

يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم فَمَاذَا تَأْمُرُونَ অর্থাৎ এই বিজ্ঞ যাদুকরের ইচ্ছা হলো তোমাদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া। এবার বল, তোমরা কি পরামর্শ দাও?

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿١١١﴾ يَأْتُوكَ بِكُلِّ
سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا
نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا
أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴿١١٥﴾ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا
سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾ وَأَوْحَيْنَا
إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ
الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا
صَاغِرِينَ ﴿١١٩﴾ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾

(১১১) তারা বলল, আপনি তাকে ও তার ভাইকে অবকাশ দান করুন এবং শহরে-বন্দরে লোক পাঠিয়ে দিন লোকদের সমবেত করার জন্য—(১১২) যাতে তারা পরাকাষ্ঠাসম্পন্ন বিজ্ঞ যাদুকরদের এনে সমবেত করে। (১১৩) বস্তুত যাদুকররা এসে ফিরাউনের কাছে উপস্থিত হল। তারা বলল, আমাদের জন্য কি কোন পারিশ্রমিক নির্ধারিত আছে, যদি আমরা জয়লাভ করি? (১১৪) সে বলল, হ্যাঁ। এবং অবশ্যই তোমরা আমার নিকটবর্তী লোক হয়ে যাবে। (১১৫) তারা বলল, হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা আমরা নিক্ষেপ করছি। (১১৬) তিনি বললেন, তোমরাই নিক্ষেপ কর। যখন তারা নিক্ষেপ করল, তখন লোকদের চোখগুলোকে ধাঁধিয়ে দিল, ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলল এবং মহাযাদু প্রদর্শন করল। (১১৭) তারপর আমি ওহীযোগে মূসাকে বললাম, এবার নিক্ষেপ কর তোমার লাঠিখানা। অতএব সঙ্গে সঙ্গে তা সে

সমুদয়কে গিলতে লাগল যা তারা বানিয়েছিল যাদুবলে। (১১৮) সুতরাং এভাবে প্রকাশ হয়ে গেল সত্য বিষয় এবং ভুল প্রতিপন্ন হয়ে গেল যা কিছু তারা করেছিল। (১১৯) সুতরাং তারা সেখানেই পরাজিত হয়ে গেল এবং অতীব লাঞ্ছিত হল। (১২০) এবং যাদুকররা সিজদায় পড়ে গেল। (১২১) বলল, আমরা ঈমান আনছি মহা বিশ্বের পরওয়ারদিগারের প্রতি (১২২) যিনি মূসা ও হারূনের পরওয়ারদিগার।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যাই হোক, পরামর্শ স্থির করে নিয়ে) তারা [ফিরাউনকে বলল, আপনি তাকে অর্থাৎ মূসা (আ)-কে] কিছুটা সময় দিন এবং (আপনার শাসনাধীন) শহরগুলোতে (অনুচর) চাপরাশীদের (হুকুমনামা দিয়ে) পাঠিয়ে দিন, যাতে তারা (সব শহর থেকে) কুশলী যাদুকরদের (সমবেত করে) আপনার কাছে এনে উপস্থিত করে। (সেমতই ব্যবস্থা নেয়া হল) আর সেসব যাদুকর ফিরাউনের নিকট এসে উপস্থিত হল (আর) বলতে লাগল, আমরা যদি [মূসা (আ)-র উপর] জয়ী হই, তবে তার বদলে আমরা (কি) কোন বড় প্রতিদান (এবং পুরস্কার) পাব? ফিরাউন বলল, হ্যাঁ (বড় পুরস্কারও পাবে) আর (তদুপরি) তোমরা (আমার) ঘনিষ্ঠ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। [ফলকথা, মূসা (আ)-কে ফিরাউনের পক্ষ থেকে এবিষয়ে খবর দেওয়া হল এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য দিন ধার্য হয়ে গেল। আর নির্ধারিত দিনে সবাই এক ময়দানে সমবেত হল। তখন---] সেই যাদুকররা [মূসা (আ)-র প্রতি] নিবেদন করল---হে মূসা, (আমরা আপনাকে এ অধিকার দিচ্ছি যে,) হয় আপনি (প্রথমে আপনার লাঠি যমীনে) ফেলুন (যাকে আপনি স্বীয় মু'জিযা বলে অভিহিত করেন) আর না হয়, (আপনি বললে) আমরাই (নিজেদের দড়ি-লাঠি মাঠে) ফেলব। (তখন) মূসা (আ) বললেন, তোমরাই (প্রথম) ফেল। যখন তারা (নিজেদের লাঠি ও দড়িসমূহ) ফেলল, তখন (যাদুর দ্বারা দর্শক) লোকদের নজরবন্দী করে দিল (যার ফলে সে লাঠি ও দড়িগুলোকে সাপের মত আঁকাবাঁকা দেখাতে লাগল) এবং তাদের উপর ভীতির সঞ্চার করে দিল। এ ভাবে বিরাট যাদু দেখাল। আর (তখন) আমি মূসা (আ)-র প্রতি (ওহীর মাধ্যমে) নির্দেশ দিলাম যে, আপনি আপনার লাঠি ফেলে দিন (সাধারণভাবে যেমন ফেলে থাকেন। অতএব,) লাঠি ফেলামাত্র তা (অজগর হয়ে) তাদের সমস্ত বানানো খেলনাগুলোকে গিলতে শুরু করে দিল। (অমনি) সত্যের (সত্যতা) প্রকাশ হয়ে গেল এবং তারা (অর্থাৎ যাদুকররা) যা কিছু বানিয়েছিল সবই পণ্ড হয়ে গেল। সুতরাং তারা (অর্থাৎ ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়) সে ক্ষেত্রে হেরে গেল এবং প্রচুর লাঞ্ছিত হল (এবং মুখ বাঁকিয়ে রয়ে গেল)। আর ঐসব যাদুকররা সিজদায় পড়ে গেল (এবং উচ্চৈস্বরে) বলতে লাগল আমরা ঈমান এনেছি বিশ্বপালকের প্রতি যিনি মূসা ও হারূন (আ)-এর ও পালনকর্তা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতগুলোতে মূসা (আ)-র অবশিষ্ট কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে যে, ফিরাউন যখন হযরত মূসা (আ)-র প্রকৃষ্ট মু'জিযা দেখল, লাঠি মাটিতে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তা সাপে পরিণত হয়ে গেল এবং আবার যখন সেটাকে হাতে ধরলেন, তখন পুনরায় লাঠি হয়ে গেল। আর হাতকে যখন গলাবন্ধের ভিতরে দাবিয়ে বের করলেন, তখন তা প্রদীপ্ত হয়ে চকমক করতে লাগল। এ ধরণের নিদর্শনের যৌক্তিক দাবি ছিল মূসা (আ)-র উপর ঈমান নিয়ে আসা, কিন্তু ভ্রান্তবাদীরা যেমন সত্যকে গোপন করার জন্য এবং তা থেকে ফিরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে বাস্তব ও সঠিক বিষয়ের উপর মিথ্যার শিরোনাম লাগিয়ে থাকে, ফিরাউন এবং তার সম্প্রদায়ের নেতারাও তাই করল। বলল যে, তিনি বড় বিজ্ঞ যাদুকর এবং তাঁর উদ্দেশ্য হলো তোমাদের দেশ দখল করে নিয়ে তোমাদের বের করে দেওয়া। কাজেই তোমরাই বল এখন কি করা উচিত?

ফিরাউনের সম্প্রদায় একথা শুনে উত্তর দিল, اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِى الْمَدَائِنِ حٰشِرِيْنَ يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ এ বাক্যটিতে اَرْجِهْ শব্দটি اِرْجَاءٌ থেকে উদ্ভূত---যার অর্থ ঢিলা দেওয়া, শিথিল করা এবং আশা দান করা। আর مَدَائِنُ শব্দটি مَدِيْنَةٌ -এর বহুবচন, যা যেকোন বড় শহরকে বলা হয়। حٰشِرِيْنَ শব্দটি حَاشِرٌ -এর বহুবচন যার অর্থ হলো আহ্বানকারী এবং সংগ্রহকারী। মর্মার্থ হল সৈন্যদল, যারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যাদুকরদের তুলে এনে একত্র করবে।

আয়াতের অর্থ দাঁড়াল এই যে, সম্প্রদায়ের লোকেরা পরামর্শ দিল যে, ইনি যদি যাদুকর হয়ে থাকেন এবং যাদুর দ্বারাই আমাদের দেশ দখল করতে চান, তবে তাঁর মুকাবিলা করা আমাদের পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। আমাদের দেশেও বহু বড় বড় অভিজ্ঞ যাদুকর রয়েছে যারা তাঁকে যাদুর দ্বারা পরাভূত করে দেবে। কাজেই কিছু সৈন্য-সামন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দিন। তারা সব শহর থেকে যাদুকরদের ডেকে নিয়ে আসবে।

তার কারণ ছিল এই যে, তখন যাদু-মন্ত্রের বহুল প্রচলন ছিল এবং সাধারণ লোকদের উপর যাদুকরদের প্রচুর প্রভাব ছিল। আর মূসা (আ)-কেও লাঠি এবং উজ্জ্বল হাতের মু'জিযা এজন্যই দেওয়া হয়েছিল যাতে যাদুকরদের সাথে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং মু'জিযার মুকাবিলায় যাদুর পরাজয় সবাই দেখে নিতে পারে। আল্লাহ্

তা'আলার সনাতন রীতিও ছিল তাই। প্রতিটি যুগের নবী-রসূলকেই তিনি সে যুগের জনগণের সাধারণ প্রবণতা অনুপাতে মু'জিযা দান করেছেন। হযরত ঈসা (আ)-র যুগে গ্রীক বিজ্ঞান ও গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞান যেহেতু উৎকর্ষের চরম শিখরে ছিল, সেহেতু তাঁকে মু'জিযা দেওয়া হয়েছিল জন্মান্ধকে দৃষ্টিসম্পন্ন করে দেওয়া এবং কুষ্ঠরোগগ্রস্তকে সুস্থ করে তোলা। রসূলে করীম (সা)-এর যুগে আরবরা সর্বাধিক পরাকাষ্ঠা অর্জন করেছিল অলংকার শাস্ত্র ও বাগ্মিতায়। তাই হুযূরে আকরাম (সা)-এর সবচেয়ে বড় মু'জিযা হল কোরআন যার মুকাবিলায় গোটা আরব-আজম অসমর্থ হয়ে পড়ে।

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ---অর্থাৎ পারিষদবর্গের পরামর্শ অনুযায়ী সমগ্র দেশ থেকে যাদুকরদের এনে সমবেত করার ব্যবস্থা করা হল। আর সেমতে যাদুকররা ফিরাউনের কাছে এসে ফিরাউনকে জিজ্ঞেস করল যে, আমরা যদি মূসার উপর জয়লাভ করতে পারি, তাহলে আমরা তার পারিশ্রমিক এবং পুরস্কার পাব তো? ফিরাউন বলল হ্যাঁ, পুরস্কার-পারিশ্রমিক তো পাবেই, তদুপরি তোমরা সবাই আমার ঘনিষ্ঠ সহচরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

মূসা (আ)-র সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যে সারা দেশ থেকে যেসব যাদুকর এসে সমবেত হয়েছিল তাদের সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনা রয়েছে। এ বিষয়ে ৯০০ থেকে শুরু করে তিন লক্ষ পর্যন্ত রেওয়ায়েত আছে। তাদের সাথে লাঠি ও দড়ির এক বিরাট স্তূপও ছিল যা ৩০০ উটের পিঠে বোঝাই করে আনা হয়েছিল।---(কুরতুবী)

ফিরাউনের যাদুকররা প্রথমে এসেই দর কষাকষি করতে শুরু করল যে, আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে এবং তাতে জয়ী হলে, আমরা কি পাব? তার কারণ, যারা ভ্রান্ত-বাদী, পার্থিব লাভই হল তাদের মুখ্য। কাজেই যে কোন কাজ করার পূর্বে তাদের সামনে থাকে বিনিময় কিংবা লাভের প্রশ্ন। অথচ নবী-রসূলরা এবং তাঁদের যাঁরা নায়েব বা প্রতিনিধি, তাঁরা প্রতি পদক্ষেপে ঘোষণা করেন: وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ অর্থাৎ আমরা যে সত্যের বাণী তোমাদের মঙ্গলের জন্য তোমাদের পৌঁছে দেই তার বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান কামনা করি না! আমাদের প্রতিদানের দায়িত্ব রাব্বুল আলামীন নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। ফিরাউন তাদেরকে বলল, তোমরা পারিশ্রমিক চাইছ? আমি পারিশ্রমিক তো দেবই; আর তার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের শাহী দরবারের ঘনিষ্ঠদেরও অন্তর্ভুক্ত করে নেব।

ফিরাউনের সাথে এসব কথাবার্তা বলে নেয়ার পর যাদুকররা হযরত মূসা (আ)-র সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থান ও সময় সাব্যস্ত করিয়ে নিল। সেমতে, এক বিস্তৃত ময়দানে এবং এক উৎসবের দিনে সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় সাব্যস্ত হল। যেমন, কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى

কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, এ সময় যাদুকরদের সর্দারের সাথে হযরত মূসা (আ) আলোচনা করলেন যে, আমি যদি তোমাদের উপর জয়লাভ করি, তবে তোমরা ঈমান গ্রহণ করবে তো ? সে বলল, আমাদের কাছে এমন যাদু রয়েছে যে, তার উপর কেউ জয়ী হতে পারে না। কাজেই আমাদের পরাজয়ের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আর সত্যিই যদি তুমি জয়ী হয়ে যাও, তাহলে প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে ফিরাউনের চোখের সামনে তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নেব।---(মাযহারী, কুরতুবী)

قَالُوا يٰمُوسٰى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ --এখানে --- اَلْقَاءٌ -এর অর্থ নিক্ষেপ করা অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য যখন মাঠে গিয়ে সবাই উপস্থিত, তখন যাদুকররা হযরত মূসা (আ)-কে বলল, হয় আপনি প্রথমে নিক্ষেপ করুন অথবা আমরা প্রথম নিক্ষেপকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই। যাদুকরদের এ উক্তিটি ছিল নিজেদের নিশ্চিন্ততা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে যে, এ ব্যাপারে আমাদের কোন পরোয়াই নেই যে, প্রথমে আমরা শুরু করি। কারণ আমরা নিজেদের শাস্ত্রের ব্যাপারে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত। তাদের বর্ণনাভঙ্গিতে একথা বোঝা যায় যে, তারা মনে মনে প্রথম আক্রমণের প্রত্যাশী ছিল, কিন্তু শক্তিমত্তা প্রকাশের উদ্দেশ্যে হযরত মূসা (আ)-কে জিজ্ঞেস করে নিল যে, প্রথমে আপনি আরম্ভ করবেন, না আমরা করব।

হযরত মূসা (আ) তাদের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে নিয়ে নিজের মু'জিযা সম্পর্কে পরিপূর্ণ আশ্বস্ততার দরুন প্রথম তাদেরকেই সুযোগ দিলেন। বললেন, اَلْقُوْا অর্থাৎ তোমরাই প্রথমে নিক্ষেপ কর।

তফসীরে ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে যে, যাদুকররা হযরত মূসা (আ)-র প্রতি আদব ও সম্মানজনক ব্যবহার করতে গিয়েই প্রথম সুযোগ নেওয়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানাল। তারই প্রতিক্রিয়ায় তাদের ঈমান আনার সৌভাগ্য হয়েছিল।

এক্ষেত্রে এটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে, একে তো যাদু হল একটা হারাম কাজ, তদুপরি তা যখন কোন একজন নবীকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে যাচ্ছে,

তখন নিঃসন্দেহে তা ছিল কুফরী। এমতাবস্থায় মূসা (আ) কেমন করে তাদেরকে সে অনুমতি দিয়ে বললেন, القوا অর্থাৎ তোমরা নিক্ষেপ কর। কিন্তু বাস্তব বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করলে এ প্রশ্নের সমাধান হয়ে যায়। কারণ এ ক্ষেত্রে এ বিষয় নিশ্চিতই ছিল যে, এরা নিজেদের যাদু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবশ্যই উপস্থাপন করবে। কথাটি হচ্ছিল শুধু প্রথমে কে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবে, আর পরে কে নামবে, তাই নিয়ে। কাজেই এখানে হযরত মূসা (আ) তাঁর মহত্ত্বের প্রমাণ হিসাবে প্রথম সুযোগ তাদেরকেই দিলেন। এতে আরও একটি উপকারিতা ছিল এই যে, প্রথমে যাদুকররা তাদের লাঠি ও দড়িগুলোকে সাপ বানিয়ে নিক; আর তারপর আসুক মূসা (আ)-র লাঠির মু'জিযা। শুধু তাই নয় যে, মূসা (আ)-র লাঠিও সাপই হোক; বরং এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করুক যে, যাদু বলে বানানো সমস্ত সাপকে গিলে খাক যাতে যাদুর প্রকাশ্য পরাজয় প্রথম ধাপেই সবার সামনে এসে যেতে পারে।---(বয়ানুল কোরআন)

আরও বলা যেতে পারে যে, মূসা (আ)-র অনুমতি দান যাদুর জন্য ছিল না; বরং তাদের অপমানকে প্রকাশ করার জন্য ছিল। এর মানে তোমরাই নিজেদের দড়ি-লাঠি নিক্ষেপ করে দেখে নাও তোমাদের যাদুর পরিণতিটা কি দাঁড়ায়! فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ অর্থাৎ যাদুকররা যখন তাদের লাঠি ও দড়িগুলো মাটিতে নিক্ষেপ করল, তখন দর্শকদের নজর-বন্দী করে দিয়ে তাদের উপর ভীতি সঞ্চারিত করে দিল এবং মহাযাদু দেখাল।

এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, তাদের যাদু ছিল এক প্রকার নজরবন্দী, যাতে দর্শকদের মনে হতে লাগল যে, এই লাঠি আর দড়িগুলো সাপ হয়ে দৌড়াচ্ছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ছিল তেমনি লাঠি ও দড়ি যা পূর্বে ছিল, সাপ হয়নি। এটা এক রকম সম্মোহনী, যার প্রভাব মানুষের কল্পনা ও দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দেয়।

কিন্তু তাই বলে একথা প্রতীয়মান হয় না যে, যাদু এ প্রকারেই সীমাবদ্ধ এবং যাদুর মাধ্যমে বাস্তব বিষয়ের পরিবর্তন ঘটতে পারে না। কারণ শরীয়তের বা যুক্তির কোন প্রমাণ এর বিরুদ্ধে স্থাপিত হয়নি বরং বিভিন্ন প্রকার যাদুর প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। কোথাও তা শুধু হাতের চালাকি, যাতে দর্শকরা একটা বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। কোথাও শুধু নজরবন্দীর কাজ করে। যেমন, কাজ করে সম্মোহনী। আর কোথাও যদি বাস্তব বিষয়ের পরিবর্তন ঘটেও যায়, যেমন মানুষের পাথর হয়ে যাওয়া, তাহলে সেটা শরীয়ত বা বৈজ্ঞানিক যুক্তির বিরুদ্ধে নয়।

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ অর্থাৎ আমি মূসা (আ)-কে নির্দেশ দিলাম যে, তোমার লাঠিটি (মাটিতে) ফেলে দাও। তা

মাটিতে পড়তেই সবচেয়ে বড় সাপ হয়ে সমস্ত সাপকে গিলে খেতে শুরু করল, যেগুলো যাদুকররা যাদুর দ্বারা প্রকাশ করেছিল।

ঐতিহাসিক বর্ণনা রয়েছে যে, হাজার হাজার যাদুকরের হাজার হাজার লাঠি আর দড়ি যখন সাপ হয়ে দৌড়াতে লাগল, তখন সমগ্র মাঠ সাপে ভরে গেল এবং সমবেত দর্শকদের মাঝে এক অদ্ভুত ভীতি ছেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হযরত মূসা (আ)-র লাঠি যখন এক বিরাট আযদাহা বা অজগরের আকার ধরে এল, তখন সে সবগুলোকে গিলে খেয়ে শেষ করে ফেলল।

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ অর্থাৎ সত্য প্রকাশিত হয়ে গেল আর যাদুকররা যা কিছু বানিয়েছিল সে সবই মিথ্যায় পরিণত হল।

فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ অর্থাৎ তখনই সবাই হেরে গেল এবং অত্যন্ত অপদস্থ হল।

وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ

অর্থাৎ যাদুকরদের সিজদায় পতিত করে দেওয়া হল এবং তারা বলতে লাগল যে, আমরা রাব্বুল আলামীনে অর্থাৎ মূসা ও হারূনের রবের প্রতি ঈমান এনেছি।

'সিজদায় পতিত করে দেওয়া হল' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মূসা (আ)-র মু'জিযা দেখে এরা এমনি হতভম্ব ও বাধ্য হয়ে গেল যে, একান্ত অজান্তেই সিজদায় পড়ে গেল। এছাড়া এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ঈমান আনার তৌফিক দিয়ে সিজদায় নিপতিত করে দিলেন। আর 'রব্বুল আলামীন'-এর সাথে 'মূসা ও হারূনের রব' যোগ করে তারা নিজেদের বিষয়টি ফিরাউনের জন্য পরিষ্কার করে দিল। কারণ সে বোকা যে নিজেকেই 'রব্বুল আলামীন' বলত। কাজেই 'রব্বি মূসা ও হারূন' বলে তাকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেওয়া হল যে, আমরা আর তোমার আল্লাহ্তে বিশ্বাসী নই।

قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ
مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٣﴾
لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٤﴾
قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ

رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۚ رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ﴿١٢٦﴾ وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ﴿١٢٧﴾

(১২৩) তোমরা কি (তাহলে) আমার অনুমতি দেওয়ার আগেই ঈমান নিয়ে আসলে----এটা যে প্রতারণা, যা তোমরা এ নগরীতে প্রদর্শন করলে যাতে করে এ শহরের অধিবাসীদের শহর থেকে বের করে দিতে পার। সুতরাং তোমরা শীঘ্রই বুঝতে পারবে। (১২৪) অবশ্যই আমি কেটে দেব তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে। তারপর তোমাদের সবাইকে শূলীতে চড়িয়ে মারব। (১২৫) তারা বলল, আমাদের তো মৃত্যুর পর নিজেদের পরওয়ারদিগারের নিকট যেতেই হবে। (১২৬) বস্তুত আমাদের সাথে তোমার শত্রুতা তো এ কারণেই যে, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের পরওয়ারদিগারের নিদর্শনসমূহের প্রতি যখন তা আমাদের নিকট পৌঁছেছে। হে আমাদের পরওয়ারদিগার, আমাদের জন্য ধৈর্যের দ্বার খুলে দাও এবং আমাদের মুসলমান হিসাবে মৃত্যু দান কর। (১২৭) ফিরাউনের সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল, তুমি কি এমনি ছেড়ে দেবে মূসা ও তার সম্প্রদায়কে দেশময় হৈ-চৈ করার জন্য এবং তোমাকে ও তোমার দেব-দেবীকে বাতিল করে দেবার জন্য? সে বলল, আমি এখনি হত্যা করব তাদের পুত্র সন্তানদের; আর জীবিত রাখব মেয়েদের। বস্তুত আমরা তাদের উপর প্রবল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ফিরাউন (অত্যন্ত ঘাবড়ে গেল যে, সমস্ত প্রজাই না আবার মুসলমান হয়ে যায়। তখন একটা বিবৃতি তৈরী করে যাদুকরদের) বলতে লাগলঃ তাহলে মূসা (আ)-র প্রতি তোমরা ঈমান এনেছ, আমার অনুমতি ছাড়াই। (তাতে) নিঃসন্দেহে (বোঝা যায় যে, যুদ্ধটি লোক দেখানোর জন্য অনুষ্ঠিত হলো) তা ছিল এমন একটা কাজ যাতে তোমাদের অনুষ্ঠান হল, এই শহরে (একটা ষড়যন্ত্র হয়ে গেছে যে, তোমরা এই করবে আর আমরা এমন করব, অতপর জয়-পরাজয় প্রকাশ করব। আর এই যে ভাগাভাগি তা এজন্য করলে) যাতে তোমরা সবাই (মিলেমিশে) এ শহর থেকে তথাকার অধিবাসীদের বহিষ্কার করে দিতে পার (এবং পরে নিশ্চিন্ত মনে এখানে সবাই মিলে সাম্রাজ্য করতে পার)। কাজেই বাস্তব বিষয়টি তোমাদের জেনে নেওয়াই উত্তম। (আর তাহল এই যে,) আমি তোমাদের একদিকের হাত এবং অপরদিকের

পা কেটে দেব এবং তারপর তোমাদের শূলীতে চড়াব (যাতে অন্যান্যেরও শিক্ষা হয়ে যায়)। তারা উত্তর দিল যে, (তাতে কোন পরোয়া নেই) আমরা মরে (তো আর কোন মন্দ ঠিকানায় যাচ্ছি না, বরং) নিজেদের মালিকের কাছেই যাব (সেখানে রয়েছে সব রকম নিরাপত্তা ও শান্তিময় সুখ। কাজেই আমাদের তাতে ক্ষতিটা কি ?)। তাছাড়া তুমি আমাদের মাঝে দোষটা কি দেখলে (যার জন্য এত হৈ চৈ তা এই তো) যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের হুকুমের প্রতি ঈমান এনেছি। (যাই হোক, এটা কোন দোষের কথা নয়। অতপর ফিরাউন থেকে ফিরে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করল যে,) হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের প্রতি ধৈর্য ধারণের কৃপা বর্ষণ কর (যাতে আমরা বিপদে স্থির থাকতে পারি)। আর আমাদের প্রাণ যেন ইসলামে স্থির থাকা অবস্থায় বের হয় (যন্ত্রণার দরুন যেন ঈমানের বিরোধী কোন কথা বেরিয়ে না আসে)। আর [মূসা (আ)-র মু'জিযা যখন সবার সামনে প্রকাশিত হয়ে গেল ও যাদুকররা ঈমান নিয়ে এল এবং আরও কোন কোন লোক যখন তাঁর অনুগত হয়ে গেল, তখন] ফিরাউনের সম্প্রদায়ের সর্দাররা (যারা সরকারে প্রচুর সম্মানিতও ছিল, তারা কোন কোন লোকের মুসলমান হয়ে যেতে দেখে ফিরাউনকে বলল,) আপনি কি মূসা (আ) এবং তাঁর সম্প্রদায়কে এভাবে (যথেচ্ছভাবে স্বাধীন) থাকতে দেবেন, যাতে তারা সারা দেশময় দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করে বেড়াবে ? (হাঙ্গামা হলো এই যে, নিজের দল ভারী করবে যার পরিণতিতে বিদ্রোহের ভয় রয়ে গেছে।) আর তিনি [অর্থাৎ মূসা (আ)] আপনাকে এবং আপনার প্রস্তাবিত উপাস্যদের পরিহার করতে থাকবে। (অর্থাৎ তাদের উপাস্য হওয়াকে অস্বীকার করতে থাকবে,) আর মূসা (আ)-র সাথে সাথে তার সম্প্রদায়ও তাই করবে ? (অর্থাৎ আপনি এর একটা বিহিত ব্যবস্থা করুন।) ফিরাউন বলল, (আপাতত এ ব্যবস্থাই সমীচীন মনে হয় যে,) আমরা তাদের সন্তানদের হত্যা করতে শুরু করি (যাতে তাদের ক্ষমতা বাড়তে না পারে। তাছাড়া নারীদের বৃদ্ধিতে যেহেতু ভয়ের কোন আশংকা নেই এবং যেহেতু আমাদের নিজেদের খিদমতের জন্যও প্রয়োজন রয়েছে, তাই) নারীদের বাঁচতে দেওয়া হোক। আর আমাদের সব রকম ক্ষমতাই তাদের উপর রয়েছে (কাজেই এ ব্যবস্থায় কোন জটিলতা সৃষ্টি হবে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এর পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে উল্লেখ ছিল যে, ফিরাউন তার সম্প্রদায়ের সর্দারদের পরামর্শ অনুযায়ী মূসা (আ)-র সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য যেসব যাদুকরকে সমগ্র দেশ থেকে এনে সমবেত করেছিল, তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দানে পরাজয় বরণ করল তো বটেই, তদুপরি হযরত মূসা (আ)-র প্রতি ঈমানও নিয়ে এল।

ঐতিহাসিক বর্ণনায় রয়েছে যে, যাদুকরদের সর্দার মুসলমান হয়ে গেলে তার দেখাদেখি ফিরাউনের সম্প্রদায়ের ছয় লক্ষ লোক মূসা (আ)-র প্রতি ঈমান নিয়ে এল এবং তা ঘোষণা করে দিল।

এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিতর্কের পূর্বে তো হযরত মূসা ও হারূন (আ) এ দু'জন ফিরাউনের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু এরপরে সবচেয়ে বড় যাদুকর যে স্বীয় সম্প্রদায়ে বিপুল প্রভাবের অধিকারী ছিল এবং তার সাথে ছিল ছয় লক্ষ মানুষ, তারা সবাই মুসলমান হয়ে যাবার দরুন একটা বিরাট শক্তি ফিরাউনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল।

সে সময় ফিরাউনের ব্যাকুলতা ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়াটা একেবারে নিরর্থক ছিল না। কিন্তু সে তা গোপন করে একজন ধূর্ত ও বিজ্ঞ রাজনীতিকের ভঙ্গিতে প্রথমে যাদুকরদের উপর বিদ্রোহমূলক অপবাদ আরোপ করল যে, তোমরা মূসা (আ)-র সাথে গোপন ষড়যন্ত্র করে এ কাজটি নিজের দেশ ও জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে করেছ। إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ অর্থাৎ এটা একটা ষড়যন্ত্র, যা তোমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঠে আসার পূর্বেই শহরের ভিতরে নিজেদের মধ্যে স্থির করে রেখেছিলে। তারপর যাদুকরদের লক্ষ্য করে বলল, آمَنتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ অর্থাৎ তোমরা কি আমার অনুমতির পূর্বেই ঈমান গ্রহণ করে ফেললে! অস্বীকৃতি-বাচক এই কৈফিয়তটি ছিল হুমকি ও তাম্বীহস্বরূপ। স্বীয় অনুমতির পূর্বে ঈমান আনার কথা বলে লোকদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল যে, আমারও কাম্য ছিল যে, মূসা (আ)-র সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারটি যদি প্রতীয়মান হয়ে যায় তাহলে আমিও তাকে মেনে নেব এবং লোকদেরও মুসলমান হওয়ার জন্য অনুমতি দান করব। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করলে এবং প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝেশুনেই একটা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে গেলে।

এই চাতুর্যের মাধ্যমে একদিকে লোকের সামনে মূসা (আ)-র মু'জিযা আর যাদুকরদের স্বীকৃতিকে একটা ষড়যন্ত্র সাব্যস্ত করে তাদেরকে আদি বিভ্রান্তিতে ফেলে রাখার ব্যবস্থা করল। অপরদিকে রাজনৈতিক চালাকিটি করল এই যে, মূসা (আ)-র কার্যকলাপ এবং যাদুকরদের ইসলাম গ্রহণ, যা একান্তই ফিরাউনের পথভ্রষ্টতাকে পরিষ্কার করে তুলে ধরার জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং জাতি ও জনসাধারণের সাথে যার কোনই সম্পর্ক ছিল না,---একটা রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক বিষয়ে পরিণত করার উদ্দেশ্যে বলল, لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا অর্থাৎ তোমরা এই ষড়যন্ত্র এ জন্য করেছ যে, তোমরা মিসর দেশের উপর জয়লাভ করে এ দেশের অধিবাসীদের এখান থেকে বহিষ্কার করতে চাও। এই চাতুর্য-চালাকীর পর সবার উপর নিজের আতঙ্ক এবং সরকারের প্রভাব ও ভীতি সঞ্চার করার জন্য যাদুকরদের হুমকি দিতে আরম্ভ করল। প্রথমে অস্পষ্ট ভঙ্গিতে বলল, فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ অর্থাৎ তোমাদের ষড়যন্ত্রের যে কি পরিণতি, তোমরা এখনই

দেখতে পাবে। অতপর তা পরিষ্কারভাবে বলল, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ অর্থাৎ আমি তোমাদের সবার বিপরীত দিকের হাত-পা কেটে তোমাদের সবাইকে শূলীতে চড়াব। বিপরীত দিকের কাটা অর্থ হল ডান হাত, বাম পা। যাতে উভয় পার্শ্বে জখমী হয়ে বেকার হয়ে পড়বে।

ফিরাউন এই দুরবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করার জন্য এবং স্বীয় পারিষদবর্গ ও জনগণকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট ব্যবস্থা নিয়েছিল। আর তার উৎপীড়নমূলক শাস্তি আগে থেকেই প্রসিদ্ধ এবং অন্তরাত্মাকে কাঁপিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

কিন্তু ইসলাম ও ঈমান এমন এক প্রবল শক্তি যে, যখন তা কোন আত্মায় বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন মানুষ সমগ্র পৃথিবী ও তার যাবতীয় উপকরণের মুকাবিলা করতে তৈরী হয়ে যায়।

যে যাদুকররা কয়েক ঘন্টা আগেও ফিরাউনকে নিজেদের খোদা বলে মানত এবং অন্যকেও এই পথভ্রষ্টতার দীক্ষা দিত, কয়েক মুহূর্তে ইসলামের কলেমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে সে কি জিনিস সৃষ্টি হয়েছিল, যাতে তারা ফিরাউনের যাবতীয় হুমকির উত্তরে বলে উঠে ঃ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ অর্থাৎ তুমি যদি আমাদেরকে হত্যা করে ফেল, তাতে কিছু এসে যায় না, আমরা আমাদের রবের কাছেই চলে যাব, যেখানে আমরা সব রকম শান্তি পাব। যাদুকররা যেহেতু ফিরাউনের প্রচণ্ড প্রতাপ ও শক্তি সম্পর্কে অবগত ছিল, সেহেতু তারা একথা বলেনি যে, আমরা তোমার আয়ত্তে আসব না, কিংবা আমরা মুকাবিলা করব; বরং তার হুমকিকে সত্য মনে করে উত্তর দিয়েছে,---একথা মানি যে, তুমি আমাদিগকে যে কোন রকম শাস্তি দিতে এই পৃথিবীতে ক্ষমতাবান, কিন্তু ঈমান আনার পর আমরা পার্থিব জীবনকে কোন বিষয়ই মনে করি না। পৃথিবী থেকে চলে গেলে এ জীবন থেকে উত্তম জীবন এবং স্বীয় পালনকর্তার সাক্ষাৎ লাভ হবে। তাছাড়া এ অর্থও হতে পারে যে, পার্থিব জীবনে তোমার যা ইচ্ছা তাই করে নাও, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা ও তোমরা সবাই আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে নীত হব। আর তিনি অত্যাচারীর কাছ থেকে অত্যাচারের বদলা নেবেন। তখন তোমার এ কাজের পরিণতি তোমার সামনে এসে হাযির হবে। অতএব, অপর এক আয়াতে এক্ষেত্রে সেই যাদুকরদের দ্বারা একথা বর্ণিত রয়েছে ঃ فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ

إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا অর্থাৎ আমাদের ব্যাপারে তোমার যা ইচ্ছা হুকুম দিয়ে দাও। ব্যাস, এতটুকুই তো যে, তোমার হুকুম আমাদের পার্থিব জীবনে চলতে পারে এবং তোমার রোষানলে আমাদের এ জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ঈমান আনার পর আমাদের দৃষ্টিতে এই পার্থিব জীবনের সে গুরুত্বই রয়নি যা ঈমান আনার পূর্বে ছিল। কারণ আমরা জেনেছি যে, এ জীবন দুঃখে হোক সুখে হোক কেটে যাবেই। চিন্তা সে জীবনের ব্যাপারে করা কর্তব্য যার পরে আর মৃত্যু নেই এবং যার শাস্তিও স্থায়ী, অশান্তিও স্থায়ী।

চিন্তা করার বিষয় যে, যারা কিছুক্ষণ আগেও নিকৃষ্টতম কুফরীতে আক্রান্ত ছিল, ফিরাউনের মত একজন বাজে লোককে খোদা হিসাবে মানত, আল্লাহ্‌র মহিমা-মহত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল, তাদের মধ্যে সহসা এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন কেমন করে এল যে, এখন বিগত সমস্ত বিশ্বাস ও কার্যক্রম থেকে একেবারে তওবা করে নিয়ে সত্য দীনের উপর এমন বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, তার জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত দেখা যায় এবং দুনিয়া থেকে বিগত হয়ে যাওয়াকে এজন্য পছন্দ করে নেয় যে, এতে স্বীয় রবের কাছে চলে যেতে পারবে।

শুধু ঈমানের শক্তি এবং আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদের সৎ সাহসই যে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় তাই নয়; বরং মনে হয়, তাদের জন্য সত্য ও প্রকৃত মা'রেফত জ্ঞানের দ্বারও যেন উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। সে কারণেই ফিরাউনের বিরুদ্ধে এহেন সাহসী বিবৃতি দেওয়ার সাথে সাথে এ প্রার্থনাও করে যে, رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পরিপূর্ণ ধৈর্য দান কর এবং মুসলমান অবস্থায় আমাদের মৃত্যু দান কর।

এতে সেই মা'রেফতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ যদি না চান, তাহলে মানুষের সাহস ও দৃঢ়তা কিছু কাজেরই নয়। কাজেই এখানে স্থিরতার প্রার্থনা করা হয়েছে। আর এ প্রার্থনা যেমন সত্যকে চিনে নেওয়ার ফল, তেমনিভাবে সেই বিপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্যও সর্বোত্তম উপায়, যাতে তারা তখন পড়েছিল। কারণ ধৈর্য ও দৃঢ়তাই এমন বিষয় যা মানুষকে তার প্রতিপক্ষের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয় লাভের নিশ্চয়তা দিতে পারে।

ইউরোপের বিগত বিশ্বযুদ্ধের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে পর্যালোচনার জন্য গঠিত কমিশন তাদের রিপোর্টে লিখেছিল যে, মুসলমান, যারা আল্লাহ্ এবং আখিরাতের উপর বিশ্বাসী, এরাই সে জাতি যে যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বাধিক বীরত্ব প্রদর্শন এবং ধৈর্য ও কষ্ট সহিষ্ণুতায় সবচেয়ে অগ্রবর্তী ছিল।

কাজেই তখন জার্মান যুদ্ধবিশারদরা জাতিকে এই তাগিদ দিত যে, সেনাবাহিনীতে ধর্মভীরুতা ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টির যেন চেষ্টা করা হয়। কারণ এতে যে শক্তি লাভ করা যায়, তা অন্য কোন কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। —(তফসীরে আল-মানার)

যাদুকরদের ঈমানী বিপ্লব হযরত মূসা (আ)-র এক বিরাট মু'জিযা ঃ পরিতাপের বিষয়, ইদানীং মুসলমানরা এবং মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের শক্তিশালী করে তোলার জন্য সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন করে চলছে, কিন্তু সে রহস্যটি তারা ভুলে গেছে যা শক্তি ও স্বকীয়তার প্রাণকেন্দ্র। অথচ ফিরাউনের যাদুকরেরাও প্রথম পর্যায়েই তা বুঝে নিয়েছিল। আর তা সারাজীবন আল্লাহ্‌র পরিচয়বিমুখ নাস্তিক কাফিরদের মুহূর্তে শুধু যে মুসলমান বানিয়ে দিয়েছিল তাই নয়; বরং একেকজনকে পরিপূর্ণ আরেফ এবং মুজাহিদে পরিণত করে দিয়েছিল। কাজেই হযরত মূসা (আ)-র এই মু'জিযা লাঠি এবং জ্যোতির্ময় হাতের মু'জিযা অপেক্ষা কম ছিল না।

ফিরাউনের উপর হযরত মূসা ও হারূন (আ)-এর ভীতিজনক প্রতিক্রিয়া ঃ ফিরাউনের ধূর্ততা এবং রাজনৈতিক চাল তার মূর্খ জাতিকে তার সাথে পুরাতন পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত থাকার ব্যাপারে কিছুটা সহায়ক হয়েছিল বটে, কিন্তু এই বিস্ময়কর ব্যাপারটি তাদের জন্য লক্ষ্য করার মত ছিল যে, ফিরাউনের সমস্ত রোষানল যাদুকরদের উপরেই শেষ হয়ে গেল। মূসা (আ) সম্পর্কে ফিরাউনের মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হল না, অথচ তিনিই ছিলেন আসল বিরোধী। কাজেই তাদেরকে বলতে হল ঃ

أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ অর্থাৎ তাহলে কি তুমি মূসা (আ) এবং তাঁর সম্প্রদায়কে এমনি ছেড়ে দেবে, যাতে তোমাকে এবং তোমার উপাস্যদের পরিহার করে দেশময় দাঙ্গা-ফাসাদ করতে থাকবে ?

এতে বাধ্য হয়ে ফিরাউন বলল ঃ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ অর্থাৎ তাঁর বিষয়টি আমাদের পক্ষে তেমন চিন্তার বিষয় নয়। আমরা তাদের জন্য এই ব্যবস্থা নেব যে, তাদের মধ্যে কোন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে হত্যা করব, শুধু কন্যা সন্তানদের বাঁচতে দেব যার ফলে কিছুকালের মধ্যেই তাদের জাতি পুরুষশূন্য হয়ে পড়বে; থাকবে শুধু নারী আর নারী। আর তারা হবে আমাদের সেবাদাসী। তাছাড়া তাদের উপরে তো আমাদের পরিপূর্ণ ক্ষমতা রয়েছেই; যা ইচ্ছা তাই করব। এরা আমাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না।

তফসীরকার আলিমগণ বলেছেন যে, সম্প্রদায়ের এহেন জেরার মুখেও ফিরাউন এ কথাই বলল যে, আমরা বনী ইসরাঈলের পুত্র-সন্তানদের হত্যা করব, কিন্তু হযরত

মূসা ও হারূন (আ) সম্পর্কে তখনও তার মুখে কোন কথাই এল না। তার কারণ, হযরত মূসা (আ)-র এই মু'জিযা এবং তার পরবর্তী ঘটনা ফিরাউনের মনমস্তিষ্কে হযরত মূসা (আ)-র ব্যাপারে নিদারুণ ভীতির সঞ্চার করেছিল।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, ফিরাউনের এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে, যখনই সে হযরত মূসা (আ)-কে দেখত, তখনই অবচেতন অবস্থায় তার পেশাব বেরিয়ে যেত। আর এটা একান্তই সত্য, সত্যভীতির এমনি অবস্থা হয়ে থাকে।

هیبت حق است ایں از خلق نیست

(আর এটা হল আল্লাহ্‌র ভীতি, মানুষের পক্ষ থেকে নয়।)

আর মাওলানা রূমী (র) বলেন ঃ

هرکے ترسید از حق وتقوی گزید -
ترسد ازوے جن وانس وهرکه دید -

অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে যে ভয় করে, সমগ্র সৃষ্টি তাকে ভয় করতে থাকে।

এক্ষেত্রে ফিরাউনের সম্প্রদায় যে বলেছে, "মূসা (আ) আপনাকে এবং আপনার উপাস্যদের পরিহার করে দাঙ্গা-ফাসাদ করতে থাকবে" এতে বোঝা যাচ্ছে যে, ফিরাউন যদিও তার সম্প্রদায়ের সামনে স্বয়ং খোদায়ীর দাবিদার ছিল এবং رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى বলে থাকত, কিন্তু নিজেও মূর্তির আরাধনা-উপাসনা করত!

আর বনী ইসরাঈলদের দুর্বল করার উদ্দেশ্যে পুত্র সন্তানদের হত্যা করার উৎপীড়ন-মূলক নৃশংস আইনের এই প্রবর্তন ছিল দ্বিতীয় বারের প্রবর্তন। এর প্রথম পর্যায় প্রবর্তিত হয়েছিল হযরত মূসা (আ)-র জন্মের পূর্বে। যার অকৃতকার্যতার ব্যাপারে তখনও সে লক্ষ্য করছিল। কিন্তু আল্লাহ্ যখন কোন জাতিকে অপদস্থ করতে চান, তার এমনি ব্যবস্থা হয়ে যায়, যার পরিণতি দাঁড়ায় একান্ত ধ্বংসাত্মক। অতপর পরবর্তীতে জানা যাবে, ফিরাউনের এই অত্যাচার-উৎপীড়ন কিভাবে তাকে এবং তার সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে মেরেছে।

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ۚ اِنَّ الْاَرْضَ
لِلّٰهِ ۙ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۭ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٢٨﴾
قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۭ قَالَ

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ
كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٩﴾ وَلَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ
مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿١٣٠﴾ فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا
هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ۗ
اَلَآ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣١﴾ وَقَالُوْا
مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾

(১২৮) মূসা বললেন তাঁর কওমকে, সাহায্য প্রার্থনা কর আল্লাহ্‌র নিকট এবং ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই এ পৃথিবী আল্লাহ্‌র। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং শেষ কল্যাণ মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে। (১২৯) তারা বলল, আমাদের কষ্ট ছিল তোমার আসার পূর্বে এবং তোমার আসার পরে। তিনি বললেন, তোমাদের পরওয়ারদিগার শীঘ্রই তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দেশের প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। তারপর দেখবেন, তোমরা কেমন কাজ কর। (১৩০) তারপর আমি পাকড়াও করেছি---ফেরাউনের অনুসারীদের দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল ফসলের ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (১৩১) অতপর যখন শুভদিন ফিরে আসে, তখন তারা বলতে আরম্ভ করে যে, এটাই আমাদের জন্য উপযোগী। আর যদি অকল্যাণ এসে উপস্থিত হয়, তবে তাতে মূসার এবং তাঁর সঙ্গীদের অলক্ষণ বলে অভিহিত করে। শুনে রাখ, তাদের অলক্ষণ যে আল্লাহ্‌রই ইলমে রয়েছে, অথচ এরা জানে না। (১৩২) তারা আরও বলতে লাগল, আমাদের উপর যাদু করার জন্য তুমি যে নিদর্শনই নিয়ে আস না কেন আমরা কিন্তু তোমার উপর ঈমান আনছি না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এই মজলিসের আলাপ-আলোচনার সংবাদ যখন বনী ইসরাঈলের কাছে গিয়ে পৌঁছল, তখন তারা ভয়ানক ভীত হল এবং মূসা (আ)-র কাছে তার উপায় জিজ্ঞেস করল। তখন) মূসা (আ) নিজ জাতিকে বললেন, আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর আর দৃঢ় থাক (ভয় করো না) এ যমীন আল্লাহ্‌র। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা এর মালিক (ও শাসক) বানাতে পারেন নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে। (সুতরাং কয়েকদিনের জন্য ফিরাউনকে দিয়ে দিয়েছেন) আর সর্বশেষ কৃতকার্যতা তারাই অর্জন করে, যারা

আল্লাহ্‌কে ভয় করে। (কাজেই তোমরা ঈমান ও পরহেযগারিতে স্থির থাক। ইনশা-আল্লাহ্‌ এই রাজ্য তোমরাই পেয়ে যাবে। কিছুদিন অপেক্ষার প্রয়োজন।) সম্প্রদায়ের লোকেরা (অত্যন্ত বিমর্ষ ও বেদনা-বিধুর মনে, যার প্রাকৃতিক তাগিদ হল অভিযোগের পুনরাবৃত্তি) বলতে লাগল যে, (হুযূর!) আমরা তো চিরকালই বিপদে রয়েছি। আপনার আগমনের পূর্বেও (ফিরাউন আমাদের বেগার খাটিয়েছে আর আমাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করেছে।) আর আপনার আগমনের পরেও (নানা রকম কষ্ট দেয়া হচ্ছে। এমনকি এখন আবারও সন্তান হত্যার প্রস্তাব স্থির হয়েছে)। মূসা (আ) বললেন, (ভয় করো না) শীঘ্রই আল্লাহ্‌ তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দেবেন। আর তার স্থলে তোমাদের এ যমীনের অধিপতি বানাবেন এবং তোমাদের কার্যপদ্ধতি লক্ষ্য করবেন (যে, তোমরা সে জন্য শুকরিয়া, ও তার মর্যাদা দান কর না অমনোযোগিতা প্রদর্শন ও পাপে লিপ্ত হও। এতে আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ দান এবং পাপের জন্য ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। আর ফিরাউন এবং তার অনুচররা যখন বিরোধিতা ও অস্বীকৃতিতে উদ্বুদ্ধ হল তখন) আমি ফিরাউনের অনুগামীদের [ফিরাউনসহ উল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী (উক্ত পারার রুকূ) সেই বিপদের সম্মুখীন] করলাম ১. দুর্ভিক্ষে এবং ২. ফল-ফসলের স্বল্প উৎপাদনের মাধ্যমে, যাতে তারা (সত্য বিষয়টি) বুঝতে পারে (এবং তা বোঝার পর গ্রহণ করে নেয়)। বস্তুত (তবুও তারা বোঝেনি বরং তাদের অবস্থা এমন ছিল যে,) যখন তাদের মাঝে সচ্ছলতা (অর্থাৎ উৎপাদনে প্রাচুর্য) আসত তখন বলত যে, এটা আমাদের জন্য হওয়াই উচিত। (অর্থাৎ আমরা ভাগ্যবান, আর এটা তারই বিকাশ। এগুলোকে আল্লাহ্‌র নিয়ামত মনে করে তার শুকরিয়া আদায় করবে এবং আনুগত্য প্রকাশ করবে তা নয়।) আর যদি তাদের কোন রকম দুরবস্থার (যেমন, দুর্ভিক্ষ কিংবা উৎপাদন স্বল্পতার) সম্মুখীন হতে হত, তখন তাকে মূসা (আ) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের অলক্ষণ বলে অভিহিত করত [উচিত ছিল নিজের দুষ্কর্ম, কুফরী ও মিথ্যার পরিণতি ও শাস্তির কথা মনে করে তওবা করে নেয়া, কিন্তু তা না করে এগুলোকে মূসা (আ) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের দুর্ভাগ্য বলে অভিহিত করত। অথচ এ সবই ছিল তাদের দুষ্কর্মের পরিণতি যেমন বলা হচ্ছে] মনে রেখো, এ সমস্ত দুর্ভাগ্যের (কারণ) আল্লাহ্‌ তা'আলার জ্ঞানে রয়েছে। (অর্থাৎ তাদের যে কুফরী কাজকর্ম তা আল্লাহ্‌র জানাই রয়েছে। আর এসব দুর্ভাগ্য তারই পরিণতি এবং শাস্তি।) কিন্তু নিজেদের ভালমন্দতে পার্থক্য করার জ্ঞানের অভাবে তাদের অধিকাংশই (একে) জানতে পারছিল না। (বরং অধিকন্তু) একথা বলত, যত আশ্চর্য বিষয়ই আমাদের সামনে হাযির করে তার মাধ্যমে আমাদের উপর যাদু চালাও (না কেন) তবুও আমরা তোমার কথা কখনও মানব না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ফিরাউন মূসা (আ)-র সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হয়ে বনী ইসরাঈলদের প্রতি তার রাগ বাড়ল যে, তাদের ছেলেদের হত্যা করে মেয়েদের জীবিত রাখার আইন

তৈরি করে দিল। এতে বনী ইসরাঈলরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল যে, মূসা (আ)-র জন্মের পূর্বে ফিরাউন তাদের উপর যে আযাব চাপিয়ে দিয়েছিল তা আবার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর মূসা (আ)-ও যখন তা উপলব্ধি করলেন, তখন একান্তই রসূলজনোচিত সোহাগ ও দর্শনানুযায়ী সে বিপদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য তাদেরকে দু'টি বিষয় শিক্ষাদান করলেন। এক. শত্রুর মুকাবিলায় আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করা এবং দুই. কার্যসিদ্ধি পর্যন্ত সাহস ও ধৈর্য ধারণ। সেই সঙ্গে এ কথাও বাতলে দিলেন যে, এই অবস্থা যদি অবলম্বন করতে পার, তাহলে এ দেশ তোমাদের, তোমরাই জয়ী হবে। এই হলো প্রথম আয়াতের বক্তব্য যাতে বলা হয়েছেঃ

اِسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا—অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর। তারপর বলা হয়েছেঃ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ সমগ্র ভূমি আল্লাহ্‌র। তিনি যাকে ইচ্ছা এই ভূমির উত্তরাধিকারী ও মালিক করবেন। আর একথা নিশ্চিত যে, শেষ পর্যন্ত মুত্তাকী পরহিযগাররাই কৃতকার্যতা লাভ করে থাকে। এখানে এই কথার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমরা যদি পরহিযগারী অবলম্বন কর যার পদ্ধতি উপরে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা ও ধৈর্য ধারণের ব্যাপারে নিয়মানুবর্তী হও, তাহলে শেষ পর্যন্ত তোমরাই হবে মিসর দেশের মালিক ও অধিপতি।

জটিলতা ও বিপদমুক্তির অমোঘ ব্যবস্থাঃ হযরত মূসা (আ) শত্রুর উপর বিজয় লাভের জন্য বনী ইসরাঈলদের যে দার্শনিকসুলভ ব্যবস্থার দীক্ষা দান করেছিলেন, গভীর-ভাবে লক্ষ্য করলে এই হচ্ছে সেই অমোঘ ব্যবস্থা, যা কখনও ভুল হয় না এবং যার অবলম্বনে বিজয় সুনিশ্চিত। এই ব্যবস্থার প্রথম অংশটি হলো আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা। এটাই হল এ ব্যবস্থার প্রকৃত প্রাণ। কারণ বিশ্বস্রষ্টা যার সহায় থাকেন, তার দিকে সমগ্র বিশ্বের সহায়তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সমগ্র সৃষ্টি হয় তাঁরই হুকুমের আওতাভুক্ত।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ যখন কোন কাজের ইচ্ছা করেন, তখন আপনা থেকেই তার উপকরণাদি সংগৃহীত হতে থাকে। কাজেই শত্রুর মুকাবিলায় বৃহত্তর শক্তিও মানুষের ততটা কাজে আসতে পারে না, যতটা আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা কাজে লাগতে পারে। অবশ্য তার শর্ত হলো এই যে, এই সাহায্য প্রার্থনা হতে হবে একান্তই সত্যনিষ্ঠার সাথে, শুধু মুখে কিছু শব্দের আবৃত্তি নয়।

দ্বিতীয় অংশটি হলো, 'সবর'-এর ব্যবস্থা। অভিধান অনুযায়ী সবর-এর প্রকৃত অর্থ হল ইচ্ছাবিরুদ্ধ বিষয়ে ধীরস্থির থাকা এবং রিপুকে আয়ত্তে রাখা। কোন বিপদে ধৈর্য

ধারণকেও সে জন্যই 'সবর' বলা হয় যে, তাতে কান্নাকাটি এবং বিলাপের স্বাভাবিক চেতনাকে দাবিয়ে রাখা হয়।

যে কোন অভিজ্ঞ বুদ্ধিমান ব্যক্তিই জানেন যে, দুনিয়ার যে কোন বৃহতোদ্দেশ্য সাধনের পথে বহু ইচ্ছাবিরুদ্ধ পরিশ্রম ও কষ্টসাইষ্ণুতা অপরিহার্য। যে লোক পরিশ্রমের অভ্যাস করে নিতে পারে এবং ইচ্ছাবিরুদ্ধ বিষয়সমূহকে সত্য করার ক্ষমতা অর্জন করে নিতে পারে, সে তার অধিকাংশ উদ্দেশ্যে সিদ্ধি লাভ করতে পারে। হাদীসে রসূলে করীম (সা)-এর ইরশাদ বর্ণিত আছে যে, সবর বা ধৈর্য এমন একটি নিয়ামত, যার চাইতে বিস্তৃত আর কোন নিয়ামত কেউ পায়নি।—(আবূ দাউদ)

হযরত মূসা (আ)-র বিজ্ঞজনোচিত উপদেশ এবং তার প্রেক্ষিতে বিজয় ও কৃতকার্যতার সংক্ষিপ্ত ওয়াদা কুটিলমতি বনী ইসরাঈল কি বুঝবে; এসব শুনে বরং বলে উঠল ঃ- اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا অর্থাৎ আপনার আগমনের পূর্বেও আমাদেরকে কষ্টই দেওয়া হয়েছে, আর আপনার আগমনের পরেও তাই হচ্ছে।

উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আপনার আগমনের পূর্বে তো এ আশায় দিন কেটে যেত যে, আমাদের উদ্ধারের জন্য কোন একজন পয়গম্বর আসবেন। অথচ এখন আপনার আগমনের পরেও উৎপীড়নের সে ধারাই যদি বহাল থাকল, তাহলে আমরা কি করব।

সে জন্যই আবারও হযরত মূসা (আ) বাস্তব বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বললেন ঃ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ বিষয়টি দূরে নয় যে, যদি তোমরা আমার উপদেশ মান্য কর, তাহলে শীঘ্রই তোমাদের শত্রুরা ধ্বংস ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, আর দেশের উপর স্থাপিত হবে তোমাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা। কিন্তু সাথে সাথে তিনি একথাও বলে দিলেন ঃ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ তার মানে এ দুনিয়ায় পার্থিব কোন রাজ্য বা প্রভুত্ব মুখ্য বিষয় নয়, বরং পৃথিবীতে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠাকল্পে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দেশিত সততার বিস্তার এবং সর্বপ্রকার অন্যায়-অনাচার প্রতিহত করার জন্যই কাউকে কোন রাজ্য বা প্রভুত্ব দান করা হয়। তাই তোমরা যখন মিসর দেশের আধিপত্য লাভ করবে, তখন সতর্ক থেকো, যাতে তোমরা রাজ্য ও শাসন ক্ষমতার নেশায় তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণতির কথা ভুলে না যাও।

রাষ্ট্রক্ষমতা রাষ্ট্রনায়ক শ্রেণীর জন্য পরীক্ষাস্বরূপ ঃ এ আয়াতে যদিও বিশেষভাবে বনী ইসরাঈলদের সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু মহান সৃষ্টিকর্তা সমগ্র শাসক শ্রেণীকেই এতদ্বারা সতর্ক করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে রাজ্য হোক বা প্রভুত্ব, তাতে

একচ্ছত্র অধিকার হল আল্লাহ্‌র। তিনিই মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করেন এবং যখন ইচ্ছা তা ছিনিয়ে নিয়ে যান। تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ আয়াতের মর্মও তাই। তদুপরি যাদেরকে পার্থিব রাজ্য দান করা হয়, প্রকৃতপক্ষে তা শাসক ব্যক্তি বা শ্রেণীর জন্য একটা পরীক্ষাস্বরূপ হয়ে থাকে যে, সে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উদ্দেশ্য—ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং নির্দেশিত কাজের প্রতি উৎসাহ দান ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব, কতটা বাস্তবায়িত করে।

'বাহ্‌রে মুহীত' নামক তফসীরে এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, ধনী আব্বাসের দ্বিতীয় খলীফা মনসূরের খিলাফত প্রাপ্তির পূর্বে একদিন হযরত আমর ইবনে ওবায়েদ (র) এসে উপস্থিত হলেন এবং এ আয়াতটি পড়লেন ঃ عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم فى الارض যাতে তাঁর (মনসূরের) খিলাফত প্রাপ্তির সুসংবাদ ছিল। ঘটনাক্রমে এরপরে পরেই মনসূর খলীফা হয়ে যান; আর হযরত আমর ইবনে ওবায়েদ (র)-এর নিকট গিয়ে হাযির হন এবং আয়াতের মাধ্যমে যে ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করেছিলেন, তা স্মরণ করিয়ে দেন। তখন হযরত আমর ইবনে ওবায়েদ (র) জওয়াব দেন যে, হ্যাঁ খলীফা হওয়ার যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, তা পূর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু একটা বিষয় এখনও বাকি রয়েছে। অর্থাৎ- فينظر كيف تعملون এর মর্মবাণী হচ্ছে এই যে, দেশের খলীফা অথবা আমীর হয়ে যাওয়া কোন গৌরবের বা আনন্দের বিষয় নয়। কেননা এরপরে আল্লাহ্ তা'আলা লক্ষ্য করেন যে, খিলাফত বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির রীতিনীতি কি ও কেমনভাবে তা পরিচালিত হচ্ছে। এখন হল তার সে দেখার ও লক্ষ্য করার সময়।

অতপর উল্লিখিত আয়াতে কৃত ওয়াদার সম্পাদন এবং ফিরাউনের সম্প্রদায়ের নানা রকম আযাবের সম্মুখীন এবং শেষ পর্যন্ত জলমগ্ন হয়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বিষয়গুলো কিছুটা সবিস্তারে বলা হয়েছে। তার মধ্যে সর্বপ্রথম আযাবটি হলো দুর্ভিক্ষ, পণ্যের দুষ্প্রাপ্যতা এবং দুর্মূল্য, ফিরাউনের সম্প্রদায় যার সম্মুখীন হয়েছিল।

তফসীর সংক্রান্ত রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, এই দুর্ভিক্ষ তাদের উপর ক্রমাগত সাত বছরকাল স্থায়ী হয়েছিল। এ দুর্ভিক্ষের বর্ণনা প্রসঙ্গেই দু'টি শব্দ سنين ও نقص ثمرات বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও হযরত কাতাদাহ (রা) প্রমুখ বলেছেন যে, দুর্ভিক্ষ ও খরাসংক্রান্ত আযাব ছিল গ্রামবাসীদের জন্য

আর ফলমূলের স্বল্পতা ছিল শহরবাসীদের জন্য। কেননা সাধারণত গ্রাম এলাকায়ই শস্যের উৎপাদন হয় বেশি এবং শহরে বেশি থাকে ফলমূলের বাগবাগিচা। তাতে এদিকেই ইঙ্গিত হয় যে, খরার কবল থেকে শস্যক্ষেত্র ফলের বাগান, কোনটাই রক্ষা পায়নি।

কিন্তু কোন জাতির উপর যখন আল্লাহ্‌র কহর বা প্রচণ্ড কোপদৃষ্টি পতিত হয়, তখন সঠিক বিষয় তাদের উপলব্ধিতে আসে না। ফিরাউনের সম্প্রদায়ও এই কহরেই পতিত হয়েছিল। আযাবের এই প্রাথমিক প্রচণ্ডতায় তাদের হুঁশ ফেরেনি। তারা এতটুকু সতর্ক হলো না, বরং এ দুর্ভিক্ষ এবং এ ধরনের অন্যান্য যে কোন আগত বিপদ-আপদকে তারা বলতে লাগল যে, এগুলো মূসা (আ)-র কওমের অমঙ্গল। فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ

অর্থাৎ যখন তারা কোন কল্যাণ ও আরাম-আয়েসপ্রাপ্ত হয়, তখন বলে যে, এগুলো আমাদের প্রাপ্য; আমাদের পাওয়াই উচিত। আর যখন কোন বিপদ বা অকল্যাণের সম্মুখীন হয়, তখন বলে, এসবই মূসা (আ) এবং তাঁর সাথী-সঙ্গীদের দুর্ভাগ্যের প্রতিক্রিয়া। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উত্তরে বলেন ঃ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ এখানে طَائِر শব্দটির আভিধানিক অর্থ উড়ন্ত জীব বা পাখী। আরবরা পাখীর ডান কিংবা বাঁ দিকে উড়াল দ্বারা ভবিষ্যৎ ভাগ্যলক্ষণ ও মঙ্গলামঙ্গল নির্ণয় করত। সেজন্যই শুধু মঙ্গলামঙ্গল সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ কথনকেও 'তায়ের' বলা হয়ে থাকে। এ আয়াতে طَائِر অর্থও তাই। কাজেই আয়াতের মর্মার্থ হল এই যে, ভাগ্যলক্ষণ ভাল হোক বা মন্দ, তা সবই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়। এই পৃথিবীতে যা কিছু প্রকাশ পায়, তা আল্লাহ্‌র কুদরতে ও ইচ্ছায় সংঘটিত হয়। তাতে না আছে কারও নহুছতের হাত, না আছে বরকতের। আর পাখীদের ডানে কিংবা বামে উড়িয়ে যে 'ফাল' বা ভবিষ্যৎ ভাগ্যপরীক্ষা করা হয় এবং উদ্দেশ্যের ভিত্তি রচনা করা হয়, তা সবই তাদের ভ্রান্ত ধারণা ও মূর্খতা।

আর শেষ পর্যন্ত ফিরাউন মূসা (আ)-র সমস্ত মু'জিযাকে যাদু বলে প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে ঘোষণা করল ঃ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ অর্থাৎ আপনি যত রকম নিদর্শন উপস্থাপন করে আমাদের উপর স্বীয় যাদু চালাতে চেষ্টা করুন না কেন, আমরা কখনও আপনার উপর ঈমান আনব না।

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ
آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿١٣٣﴾ وَلَمَّا وَقَعَ
عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن
كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٣٤﴾
فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿١٣٥﴾
فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا
عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٣٦﴾

(১৩৩) সুতরাং আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত প্রভৃতি বহুবিধ নিদর্শন একের পর এক। তারপরেও তারা গর্ব করতে থাকল। বস্তুত তারা ছিল অপরাধপ্রবণ। (১৩৪) আর তাদের উপর যখন কোন আযাব পড়ে তখন বলে, হে মসা! আমাদের জন্য তোমার পরওয়ারদিগারের নিকট সে বিষয়ে দোয়া কর যা তিনি তোমাদের সাথে ওয়াদা করে রেখেছেন। যদি তুমি আমাদের উপর থেকে এ আযাব সরিয়ে দাও, তবে অবশ্যই আমরা ঈমান আনব তোমার উপর এবং তোমার সাথে বনী ইসরাঈলদের যেতে দেব। (১৩৫) অতপর যখন আমি তাদের উপর থেকে আযাব তুলে নিতাম নির্ধারিত একটি সময় পর্যন্ত— যেখান পর্যন্ত তাদেরকে পৌঁছানো উদ্দেশ্য ছিল, তখন তড়িঘড়ি তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত। (১৩৬) সুতরাং আমি তাদের কাছ থেকে বদলা নিয়ে নিলাম—বস্তুত তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে দিলাম। কারণ, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল আমার নিদর্শনসমূহকে এবং তৎপ্রতি অনীহা প্রদর্শন করেছিল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[যখন ঔদ্ধত্য অবলম্বন করল, তখন) পুনরায় আমি [উল্লিখিত দু'টি বিপদ ছাড়াও এই বিপদগুলো তাদের উপর আরোপ করলাম (৩) তাদের উপর প্রবল বৃষ্টিসহ] তুফান পাঠিয়ে দিলাম (যাতে তাদের সম্পদ ও প্রাণনাশের আশংকা দেখা দিল)। আর এতে ঘাবড়ে গিয়ে মূসা (আ)-র কাছে সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা করল যে, আমাদের উপর থেকে এ বিপদ সরাবার ব্যবস্থা করুন, তাহলে আমরা ঈমান আনব এবং আপনি যা বলবেন তার অনুসরণ করব। অতপর যখন সেসমস্ত বিপদ দূর হয়ে গেল এবং

মনোমত শস্যাদি উৎপন্ন হল, তখন আবার নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ল যে, এবার তো রক্ষা পেলাম; সম্পদও প্রচুর হবে। আর তেমনিভাবে নিজেদের কুফরী ও গোমরাহীকে আকড়ে রইল, তখন আমি তাদের শস্য ক্ষেতে (৪) পঙ্গপাল (পাঠিয়ে দিলাম) আর [পুনরায় যখন নিজেদের শস্যক্ষেতগুলোকে ধ্বংস হয়ে যেতে দেখল, তখন আবার ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তেমনিভাবে ওয়াদা-প্রতিজ্ঞা করল। এভাবে পুনরায় যখন হযরত মূসা (আ)-র দোয়ায় সে বিপদ খণ্ডে গেল এবং শস্যাদি যথারীতি ঘরে তুলে আনল, তখন আবার তেমনি পূর্বের মতই নিশ্চিন্ত হয়ে গেল এবং ভাবল, এবার তো শস্যাদি আয়ত্তেই এসে গেছে, কাজেই আবারও নিজেদের কুফরী ও বিরোধিতায় আঁকড়ে থাকল] তখন আমি সে শস্যে (৫) ঘুন পোকা (জন্মিয়ে দিলাম) আর যখন ঘাবড়ে গিয়ে আবার তেমনিভাবে ওয়াদা-প্রতিজ্ঞা করে দোয়া করাল এবং তাতে সে বিপদও কেটে গেল এবং নিশ্চিন্ত হয়ে গেল যে, এবার কুটে-পিষে খাওয়া যাবে। কাজেই আবারও সেই কুফরী এবং বিরোধিতা আরম্ভ করল। তখন আমি তাদের সে খাদ্যকে এখানে বিস্বাদ করে দিলাম যে, তাতে (৬) ব্যাঙ [এসে ভিড় করে তাদের খাবার পাত্রে ও হাড়িতে পড়তে শুরু করল এবং তাতে সমস্ত খাবার বিনষ্ট হয়ে গেল। এমনকি ঘরে বসাও দুষ্কর হয়ে পড়ল আর পানি পান করাও দুষ্কর হয়ে পড়ল যে, (৭) তাদের সব] পানি মুখে নেওয়ার সাথে সাথেই রক্তে পরিণত হয়ে যেত। (যা হোক, তাদের উপর এসব বিপদ আরোপিত হয়েছিল। এসবই মূসা (আ)-র প্রকৃষ্ট মু'জিযা ছিল যা প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ ও বিরোধিতার কারণে। (আর লাঠি ও কিরণময় হাতের মু'জিযাসহ এই সাতটি মু'জিযাকে বলা হয় আয়াতে তিস্আ' বা নয় নিদর্শন। বস্তুত এই মু'জিযাসমূহ দেখার পর শিথিল হয়ে পড়াই উচিত ছিল)। কিন্তু তারা (তখনও) তাকাব্বুর(-ই) করতে থাকে আর তারা ছিলও কিছুটা অপরাধপ্রবণ লোক (যে এতসব কঠিন বিপদের পরেও তা থেকে বিরত হচ্ছিল না)। বস্তুত তাদের উপর যখন উল্লিখিত বিপদের কোন একটি আযাব আসত, তখন তারা বলত, হে মূসা! আমাদের জন্য আপনার পরওয়ারদিগারের নিকট সে বিষয়ে প্রার্থনা করুন, যে বিষয় তিনি আপনার সাথে ওয়াদা করে রেখেছেন। (আর তা হল আমাদের বিরত হয়ে যাওয়ার পর বিপদমুক্ত করা)। আমরা এখন প্রতিজ্ঞা করছি যে, আপনি যদি এ আযাবটি আমাদের উপর থেকে সরিয়ে দেন (অর্থাৎ দোয়া করে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন, তাহলে আমরা অবশ্য অবশ্যই আপনার কথামত ঈমান আনব এবং আমরা বনি ইসরাঈলদিগকেও মুক্তি দিয়ে আপনার সাথে দিয়ে দেব)। অতপর মূসা (আ)-র দোয়ার বরকতে যখন তাদের উপর থেকে সে আযাবকে নির্ধারিত সময়ের জন্য সরিয়ে রাখা হত, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে আরম্ভ করত (যেমন, উপরে বর্ণিত হয়েছে)। তারপর যখন নানাভাবে দেখে নিলাম যে, তারা নিজেদের অসদাচরণ থেকে কিছুতেই বিরত হচ্ছে না, তখন আমি তাদের উপর পূর্ণ প্রতিশোধ নিলাম। অর্থাৎ তাদেরকে সাগরে নিমজ্জিত করে দিলাম (যেমন, অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। তার কারণ, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা

প্রতিপন্ন করত এবং সেগুলোর প্রতি সম্পূর্ণভাবে অমনোযোগিতা প্রদর্শন করত। আর মিথ্যারোপ ও গাফলতীও যেমন তেমন নয়, বরং একান্ত বিদ্বেষ ও হঠকারিতার সাথে আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা করে করে ভঙ্গ করেছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতগুলোতে ফিরাউনের সম্প্রদায় এবং হযরত মূসা (আ)-র অবশিষ্ট কাহিনীর আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ফিরাউনের যাদুকররা মূসা (আ)-র সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গিয়ে ঈমান এনেছে, কিন্তু ফিরাউনের সম্প্রদায় তেমনি ঔদ্ধত্য ও কুফরীতে আঁকড়ে রয়েছে।

এ ঘটনার পর ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মূসা (আ) বিশ বছর যাবৎ মিসরে অবস্থান করে সেখানকার অধিবাসীদের আল্লাহ্‌র বাণী শোনান এবং সত্য ও সরল পথের দিকে আহবান করতে থাকেন। এ সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে নয়টি মু'জিযা দান করেছিলেন। এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল ফিরাউনের সম্প্রদায়কে সতর্ক করে সত্যপথে আনা। وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ আয়াতে এই নয়টি মু'জিযা সম্পর্কেই বলা হয়েছে।

এই নয়টি মু'জিযার মধ্যে সর্বপ্রথম দু'টি মু'জিযা অর্থাৎ লাঠি সাপে পরিণত হওয়া এবং হাত কিরণময় হওয়া ফিরাউনের দরবারে প্রকাশিত হয়। আর এগুলোর মাধ্যমেই যাদুকরদের বিরুদ্ধে হযরত মূসা (আ) জয়লাভ করেন। তারপরের একটি মু'জিযা যার আলোচনা পূর্ববর্তী আয়াতে করা হয়েছে, তা ছিল ফিরাউনের সম্প্রদায়ের হঠকারিতা ও দুরাচরণের ফলে দুর্ভিক্ষের আগমন---যাতে তাদের ক্ষেতের ফসল এবং বাগ-বাগিচার উৎপাদন চরমভাবে হ্রাস পেয়েছিল। ফলে এরা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত হযরত মূসা (আ)-র মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি লাভের দোয়া করায়। কিন্তু দুর্ভিক্ষ রহিত হয়ে গেলে পুনরায় নিজেদের ঔদ্ধত্যে লিপ্ত হয় এবং বলতে শুরু করে যে, এই দুর্ভিক্ষ তো মূসা (আ)-র সঙ্গী-সাথীদের অলক্ষণের দরুনই আপতিত হয়েছিল। আর এখন যে দুর্ভিক্ষ রহিত হয়েছে তাহল আমাদের সুকৃতির স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। এমনটিই তো আমাদের প্রাপ্য।

পরবর্তী ছয়টি মু'জিযার বিষয় আলোচিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতগুলোতে।

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ অর্থাৎ---অতপর আমি তাদের উপর পাঠিয়েছি তুফান, পঙ্গপাল, ঘুন পোকা, ব্যাঙ এবং রক্ত। এতে ফিরাউনের সম্প্রদায়ের উপর আপতিত পাঁচ

রকমের আযাবের কথা আলোচিত হয়েছে এবং এগুলোকে উক্ত আয়াতে آيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর তফসীর অনুযায়ী এর অর্থ হল এই যে, এগুলির মধ্যে প্রত্যেকটি আযাবই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত থেকে রহিত হয়ে যায় এবং কিছুসময় বিরতির পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় আযাব পৃথক পৃথকভাবে আসে।

ইবনে মুন্‌যির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা')-এর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, এর প্রতিটি আযাব ফিরাউনের সম্প্রদায়ের উপর সাত দিন করে স্থায়ী হয়। শনিবার দিন শুরু হয়ে দ্বিতীয় শনিবারে রহিত হয়ে যেত এবং পরবর্তী আযাব আসা পর্যন্ত তিন সপ্তাহের অবকাশ দেওয়া হত।

ইমাম বগভী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, প্রথমবার যখন ফিরাউনের সম্প্রদায়ের উপর দুর্ভিক্ষের আযাব চেপে বসে এবং হযরত মূসা (আ)-র দোয়ায় তা রহিত হয়ে যায়, এবং তারা নিজেদের ঔদ্ধত্য থেকে বিরত হয় না, তখন হযরত মূসা (আ) দোয়া করেন, হে আমার পরওয়ারদিগার, এরা এতই উদ্ধত যে, দুর্ভিক্ষের আযাবেও প্রভাবিত হয়নি; নিজেদের কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে। এবার তাদের উপর এমন কোন আযাব চাপিয়ে দাও, যা হবে তাদের জন্য বেদনাদায়ক এবং আমাদের জাতির জন্য উপদেশের কাজ করবে ও পরবর্তী-দের জন্য যা হবে ভর্ৎসনামূলক শিক্ষা। তখন আল্লাহ্ প্রথমে তাদের উপর নাযিল করেন তুফানজনিত আযাব। প্রখ্যাত মুফাস্‌সিরদের মতে তুফান অর্থ পানির তুফান; অর্থাৎ জলোচ্ছ্বাস। তাতে ফিরাউনের সম্প্রদায়ের সমস্ত ঘর-বাড়ী ও জমি-জমা জলোচ্ছ্বাসের আবর্তে এসে যায়। না থাকে কোথাও শোয়া-বসার জায়গা, না থাকে জমিতে চাষ-বাসের কোন ব্যবস্থা। আরো আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, ফিরাউন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই ছিল বনি ইসরাঈলদেরও জমি-জমা ও ঘরবাড়ী। অথচ বনি ইস-রাঈলদের ঘরবাড়ী, জমি-জমা সবই ছিল শুষ্ক। সেগুলোর কোথাও জলোচ্ছ্বাসের পানি ছিল না, অথচ ফিরাউন সম্প্রদায়ের জমি ছিল অথৈ জলের নীচে।

এই জলোচ্ছ্বাসে ভীত হয়ে ফিরাউন সম্প্রদায় হযরত মূসা (আ)-র নিকট আবেদন করল, আপনার পরওয়ারদিগারের দরবারে দোয়া করুন তিনি যেন আমাদের থেকে এ আযাব দূর করে দেন। তাহলে আমরা ঈমান আনব এবং বনি ইসরাঈলদের মুক্ত করে দেব। মূসা (আ)-র দোয়ায় জলোচ্ছ্বাসের তুফান রহিত হয়ে গেল এবং তারপর তাদের শস্য-ফসল অধিকতর সবুজ শ্যামল হয়ে উঠল। তখন তারা বলতে আরম্ভ করল যে, আদতে এই তুফান তথা জলোচ্ছ্বাস কোন আযাব ছিল না; বরং আমাদের ফায়দার জন্যেই তা এসেছিল। যার ফলে আমাদের

শস্যভূমির উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে গেছে। সুতরাং মূসা (আ)-র এতে কোন দখল নেই। এসব কথা বলেই তারা কৃত প্রতিজ্ঞার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতে শুরু করে।

এভাবে এরা মাসাধিককাল সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। আল্লাহ্ তাদের চিন্তা-ভাবনার অবকাশ দান করলেন। কিন্তু তাদের চৈতন্যোদয় হল না। তখন দ্বিতীয় আযাব পঙ্গপালকে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হল। এই পঙ্গপাল তাদের সমস্ত শস্য-ফসল ও বাগানের ফল-ফলারী খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলল। কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, কাঠের দরজা-জানালা, ছাদ প্রভৃতিসহ ঘরে ব্যবহার্য সমস্ত আসবাবপত্র পঙ্গপালেরা খেয়ে শেষ করে ফেলেছিল। আর এ আযাবের ক্ষেত্রেও মূসা (আ)-র মু'জিযা পরিলক্ষিত হয় যে, এই সমস্ত পঙ্গপালই শুধুমাত্র কিবতী বা ফিরাউনের সম্প্রদায়ের শস্যক্ষেত্র ও ঘরবাড়ীতে ছেয়ে গিয়েছিল। সংলগ্ন ইসরাঈলীদের ঘর-বাড়ী, শস্যভূমি ও বাগ-বাগিচা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকে।

এবারও ফিরাউনের সম্প্রদায় চীৎকার করতে লাগল এবং মূসা (আ)-র নিকট আবেদন জানাল, এবার আপনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দোয়া করে আযাব সরিয়ে দিলে আমরা পাকা ওয়াদা করছি যে, ঈমান আনব এবং বনি ইসরাঈলদের মুক্তি দিয়ে দেব। তখন মূসা (আ) আবার দোয়া করলেন এবং এ আযাবও সরে গেল। আযাব সরে যাওয়ার পর তারা দেখল যে, আমাদের কাছে এখনও এ পরিমাণ খাদ্যশস্য মওজুদ রয়েছে, যা আমরা আরও বৎসরকাল খেতে পারব। তখন আবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে এবং ঔদ্ধত্য প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হল। ঈমানও আনল না, বনি ইসরাঈলদেরও মুক্তি দিল না।

আবার আল্লাহ্ তা'আলা এক মাসের জন্য অবকাশ দান করলেন। এই অবকাশের পর তাদের উপর চাপালেন তৃতীয় আযাব قُمَّل (কুম্মাল) قمل সেই উকুনকে বলা হয়, যা মানুষের চুলে বা কাপড়ে জন্মে থাকে এবং সেসব পোকা বা কীটকেও বলা হয়, যা কোন কোন সময় খাদ্যশস্যে পড়ে এবং যাকে সাধারণত ঘুন এবং কেরী পোকাও বলা হয়। কুম্মালের এ আযাবে সম্ভবত উভয় রকমের পোকাই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের খাদ্যশস্যেও ঘুন ধরেছিল এবং শরীরে, মাথায়ও উকুন পড়েছিল বিপুল পরিমাণে।

সে ঘুনের ফলে খাদ্যশস্যের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে, দশ সের গমে তিন সের আটাও হতো না। আর উকুন তাদের চুল-ভ্রূ পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছিল।

শেষে আবার ফিরাউনের সম্প্রদায় ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল এবং মূসা (আ)-র নিকট এসে ফরিয়াদ করল, এবার আর আমরা ওয়াদা ভঙ্গ করব না, আপনি দোয়া করুন। হযরত মূসা (আ)-র দোয়ায় এ আযাবও চলে গেল। কিন্তু যে হতভাগাদের জন্য ধ্বংসই ছিল অনিবার্য, এরা প্রতিজ্ঞা পূরণ করবে কেমন করে! তারা অব্যাহতি লাভের সাথে সাথে সবই ভুলে গেল এবং অস্বীকার করে বসল।

তারপর আবার এক মাসের সময় দেওয়া হলো, যাতে প্রচুর আরাম-আয়েসে কাটাল। কিন্তু যখন এই অবকাশেরও কোন সুযোগ নিল না, তখন চতুর্থ আযাব হিসেবে এসে হাযির হল ব্যাঙ। এত অধিকসংখ্যায় ব্যাঙ তাদের ঘরে জন্মাল যে, কোনখানে বসতে গেলে গলা পর্যন্ত উঠত ব্যাঙের স্তূপ। শুতে গেলে ব্যাঙের স্তূপের নীচে তলিয়ে যেতে হতো, পাশ ফেরা অসম্ভব হয়ে পড়ত। রান্নার হাড়ি, আটা-চালের মটকা বা টিন সবকিছুই ব্যাঙে ভরে যেত। এই আযাবে অসহ্য হয়ে সবাই বিলাপ করতে লাগল এবং আগের চাইতেও পাকা-পাকি ওয়াদার পর হযরত মূসা (রা)-র দোয়ায় এ আযাবও সরলো।

কিন্তু যে জাতির উপর আল্লাহ্‌র গযব চেপে থাকে তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা, জ্ঞান-চেতনা কোন কাজই করে না। কাজেই এ ঘটনার পরেও আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে এরা আবারও নিজেদের হঠকারিতায় আঁকড়ে বসল এবং বলতে আরম্ভ করল যে, এবার তো আমাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়ে গেছে যে, মূসা (আ) মহাযাদুকর, আর এসবই তাঁর যাদুর কীর্তি-কাণ্ড।

অতপর আরেক মাসের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে অব্যাহতি দান করলেন, কিন্তু তারা এরও কোন সুযোগ নিল না। তখন এল পঞ্চম আযাব 'রক্ত'। তাদের সমস্ত পানাহারের বস্তু রক্তে রূপান্তরিত হয়ে গেল। কূপ কিংবা হাউয থেকে পানি তুলে আনলে তা রক্ত হয়ে যায়, খাবার রান্না করার জন্য তৈরি করে নিলে, তাও রক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এ সমস্ত আযাবের বেলায়ই হযরত মূসা (আ)-র এ মু'জিযা বরাবর প্রকাশ পেতে থাকে যে, যে কোন আযাব থেকে ইসরাঈলীরা থাকে মুক্ত ও সুরক্ষিত। রক্তের আযাবের সময় ফিরাউনের সম্প্রদায়ের লোকেরা বনি ইসরাঈলদের বাড়ী থেকে পানি চাইত। কিন্তু তা তাদের হাতে যাওয়া মাত্র রক্তে পরিণত হয়ে যেত। একই দস্তর-খানে বসে কিবতী ও বনি ইসরাঈল খাবার খেতে গেলে যে লোকমাটি বনি ইসরাঈলেরা তুলত তা যথারূপ থাকত, কিন্তু যে লোকমা বা পানির ঘোট কোন কিবতী মুখে তুলত তাই রক্ত হয়ে যেত। এ আযাবও পূর্বরীতি-নিয়ম অনুযায়ী সাত দিন পর্যন্ত স্থায়ী হল এবং আবার এই দুরাচার প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী জাতি চীৎকার করতে লাগল। অতপর হযরত মূসা (আ)-র নিকট ফরিয়াদ করল এবং অধিকতর দৃঢ়ভাবে ওয়াদা করল। দোয়া করা হলে এ আযাবও সরে গেল, কিন্তু এরা তেমনি গুমরাহীতে স্থির থাকল। এ বিষয়েই কোরআন বলেছে—فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ অর্থাৎ এরা আত্মগর্ব প্রকাশ করতে থাকল। বস্তুত এরা ছিল অপরাধে অভ্যস্ত জাতি।

অতপর ষষ্ঠ আযাবের আলোচনা প্রসঙ্গে আয়াতে رِجْز -এর নাম বলা হয়েছে। এই শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্লেগ রোগকে বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। অবশ্য বসন্ত প্রভৃতি মহামারীকেও رِجْز (রিজ্‌য) বলা হয়। তফসীর সংক্রান্ত রেওয়ায়েতে উল্লেখ

রয়েছে যে, ওদের উপর প্লেগের মহামারী চাপিয়ে দেওয়া হয়, যাতে তাদের ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) লোকের মৃত্যু ঘটেছিল। তখন আবারও তারা নিবেদন করে এবং পুনরায় দো'য়া করা হলে প্লেগের আযাবও তাদের উপর থেকে সরে যায়। কিন্তু তারা যথারীতি ওয়াদা ভঙ্গ করে। ক্রমাগত এতবার পরীক্ষা ও অবকাশ দানের পরেও যখন তাদের মধ্যে অনুভূতির সৃষ্টি হয়নি তখন চলে আসে সর্বশেষ আযাব। তাহল এই যে, তারা নিজেদের ঘর-বাড়ী, জমি-জমা ও আসবাবপত্র ছেড়ে মূসা (আ)-র পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত লোহিত সাগরের গ্রাসে পরিণত হয়। তাই বলা হয়েছে—

فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا
الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ
بِمَا صَبَرُوْا ؕ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا
يَعْرِشُوْنَ ﴿١٣٧﴾ وَجٰوَزْنَا بِبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ
يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا
لَهُمْ اٰلِهَةٌ ؕ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿١٣٨﴾ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ
فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٩﴾ قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا
وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٤٠﴾ وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ
يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۚ يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ
نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿١٤١﴾

(১৩৭) আর যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকেও আমি উত্তরাধিকার দান করেছি এ ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের, যাতে আমি বরকত সন্নিহিত রেখেছি এবং পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তোমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত কল্যাণ বনি ইসরাঈলদের জন্য তাদের ধৈর্যধারণের দরুন। আর ধ্বংস করে দিয়েছি সে সবকিছু যা তৈরি করেছিল